A Literary Journal of Sir Gurudas Mahavidyalaya

আয়ুষ

AYUSH

2019-2021

কবিতা
গদ্য
ছবিঘর
গল্প

বিশ্বব্যাপ্ত এই মহাসংকটের সময়ে
আসুন, আমরা সকলে
আরো বেঁধে বেঁধে থাকি॥

অতিমারির মহা-অন্ধকার
অতিক্রম করে
আমরা হয়ে উঠি
তিমিরবিনাশী।

* * *

এই অতিমারির ভয়াল পৃথিবীতে
যাঁরা ছেড়ে গেলেন
এই সুন্দর পৃথিবী
তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে
আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা॥

* * *

যাঁরা হারালেন স্বজন,
তাঁদের প্রতি
আমাদের আন্তরিক সমানুভূতি॥

॥ স্যর গুরুদাস মহাবিদ্যালয় ॥

আয়ুস্

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়ের
বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা

২০১৯ - ২০২০

২০২০ - ২০২১

যুগ্ম সংখ্যা

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়
৩৩/৬/১, বিপ্লবী বারীন ঘোষ সরণি, মুরারিপুকুর, উল্টোডাঙা
কলকাতা - ৭০০০৬৭
www.sirgurudasmahavidyalaya.com

‘AYUSH’, a literary journal of
Sir Gurudas Mahavidyalaya, Kolkata-67
Joint Issue, 2019-2021

আয়ুস্

• উপদেষ্টা •
ড. মণিশঙ্কর রায় (অধ্যক্ষ)
শ্রী দেবাশিস বর্মন (সম্পাদক, শিক্ষক সংসদ)
ড. পারমিতা হালদার
ড. প্রশান্ত কুমার দে
ড. রত্না লোধ
শ্রী পার্থ চক্রবর্তী (ও.সি)

• যুগ্ম সম্পাদক •
ড. অরুণাভ সিনহা
ড. প্রশান্ত ঘোষাল

• সম্পাদকমণ্ডলী •
ড. মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়
ড. শিঞ্জিনী বসু
ড. কাজল দে
ড. মীনাক্ষী গোস্বামী
ড. শুভংকর সাহা
শ্রীমতী তনুশ্রী বকসী পাকড়াশী
শ্রী চন্দন আঢ্য
শ্রীমতি মৌসুমী দত্ত (ছাত্র প্রতিনিধি)
শ্রীমতি অঙ্কুশা ঘোষ (ছাত্র প্রতিনিধি)

• আঙ্গিক বিন্যাস ও প্রচ্ছদ •
শ্রী শুভেন্দু দাশমুন্সী

• মুদ্রক •
জেপিএস ইনফোমিডিয়া
কলকাতা - ৭০০০৪৬

AYUSH

LITERARY JOURNAL OF
SIR GURUDAS
MAHAVIDYALAYA
JOINT-ISSUE
2019-2021

আয়ুস্

স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়ের
বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা
যুগ্ম সংখ্যা
২০১৯ - ২০২১

সূচিপত্র

অধ্যক্ষের কলম | ৭
সম্পাদকের কলম | ৯
শিক্ষাকর্মীবন্ধুর কলম | ১১
ছাত্রদের কলম | ১২

কবিতার পাতা

বিচারে বিভ্রাট | রণজিৎ দাস | ১৪
দেবতা জীব | মৌসুমী দত্ত | ১৫
গঙ্গোত্রী শোভা | পূর্ণিমা বিশ্বাস | ১৬
দশচক্রে পিষ্ট কোনও এক বিপন্ন বিস্মিতের প্রতি | রমিতা সেনগুপ্ত | ১৭
"তুমিই" তখন একা | নয়ন ভৌমিক | ১৯
ব্যাকুল প্রার্থনা | শুভন দাস | ১৯
নির্ভাবনার মনের কথা | অর্কজিৎ ব্যানার্জি | ২০
কাজের মেয়ে | গৌতম মণ্ডল | ২১
টাকার মহিমা | মেঘা সিং | ২২
আমরা | শিখা মধু | ২৩
সংহতি | আলমগীর মণ্ডল | ২৪
লেকটাউনের ছড়া | তিয়াসা ঘোষ | ২৪
একুশ আমার পরিচয় | নাহিদা সুলতানা | ২৫
মাটির কান্না আর বাঁচার লড়াই | অনির্বাণ ঘোষ | ২৬
স্বাধীনতার মহানায়কদের উদ্দেশে | ঈশিতা তালুকদার | ২৭

ফেরারী কৈশোর | অরুণাভ সিংহ | ২৮
Smile and Smile | Abdul Sahidar Dhali | ২৯
Life, Love and Art | Prof. Farid Mondal | ২৯
सारे जहां से अच्छा इण्डिया हमारा | इन्द्रजीत यादव | ৩০
इक्कीसवीं सदीका झरोखा | शम्पा पान्डा | ৩০

প্রবন্ধ নিবন্ধ

পথের পাঁচালী সিনেমা নির্মাণের নেপথ্য কাহিনি | অধ্যাপক দেবযানী নায়ক | ৩২
পোস্টার শিল্পের কয়েকটি ধাপ | নিহিত মল্লিক | ৪০
প্রসঙ্গ ঃ পণপ্রথা | পুষ্পিতা বাগ | ৪৩
পরিবেশ দূষণ | ডোনা বৈদ্য | ৪৪
পৃথিবী ও জীবের সৃষ্টি | দীপঙ্কর পাল | ৪৮
An essay based on a research on 'Violation of Women' | Paramita Halder | **50**
HOPE | Sk. Sahil Rahaman | **52**
Balance Sheet of Life | Ram Ratan Singha | **53**
REASON BEHIND FAILING | Ankita Das | **54**

গল্পের পাতা

স্বপ্ন হলেও সত্যি | সৌম্যদীপ ঘোষ | ৫৬
স্বপ্নের ঘোরে | রানা পাল | ৫৮
তুলসীরা ঝরে যায় | দীনরঞ্জন দাস | ৬১

চিত্র ঘর

মৌমিতা আঢ্য | ৬৪
সংযুক্তা রায় | ৬৫
সহেলী সরকার | ৬৬
ডোনা বৈদ্য | ৬৭
অঞ্জলি দেবনাথ | ৬৮
ত্রিয়াঙ্কা দত্ত | ৬৯
পূজা সামন্ত | ৭০
অমিত মাইতি | ৭১
রেনিকা বিশ্বাস | ৭২

অধ্যক্ষের কলম

করোনা অতিমারির করাল থাবায় সমগ্র পৃথিবী যখন বিপন্ন, বিধ্বস্ত — তার ভয়াবহ প্রভাব দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কোণে কোনও না কোনও ভাবে পড়বেই, এ’খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। স্যার গুরুদাস মহাবিদ্যালয়ের নানাবিধ কর্মযজ্ঞে তার ছায়া তো থাকবেই। তবু তারই মধ্যে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে সাহিত্য পত্রিকা ‘আয়ুস্’ ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১-এর প্রকাশ খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং আশাব্যঞ্জক। সকলের ঐকান্তিক চেষ্টার ফসল এই সাহিত্য পত্রিকা। তাই সবাইকে অভিনন্দন জানাই —

ড. মণিশঙ্কর রায়

সম্পাদকের কলম

অবশেষে মহাবিদ্যালয়ের সাহিত্য পত্রিকা আয়ুস্ ২০১৯-২০২০ এবং ২০২০-২০২১ এর প্রকাশ ঘটতে চলেছে। সেই বিচারে এটি যুগ্ম সংখ্যা। ২০১৮-২০১৯ ও তার পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ধারাবাহিকভাবে বার্ষিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হলেও ২০১৯-২০২০ বর্ষে এসে সেই ধারাবাহিকতাকে যে অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হল না — তার একমাত্র কারণ বিশ্বব্যাপী করোনার প্রকোপ। পৃথিবীর প্রতি প্রান্তে প্রতিনিয়ত যখন শত-সহস্র মানুষের মৃত্যু মিছিল তখন রোজকার বেঁচে থাকার লড়াইয়ের চেয়ে আর কিছুকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়ার উপায় থাকে না। আর সেই বেঁচে থাকার, টিকে থাকার এবং ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইতে আয়ুস-এর খানিক বিলম্বিত প্রকাশকে বোধহয় স্বাভাবিক সঙ্গত বলেই ধরা হবে।

ড. অরুণাভ সিনহা
ড. প্রশান্ত ঘোষাল

শিক্ষাকর্মীবন্ধুর কলম

পৃথিবীব্যাপী এই চরম বিপদের সময়, সবাই যখন গৃহবন্দি, তখন আমরা এসেছি কলেজে। করোনাবিধি মেনেই চালু রাখতে হয়েছে কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্ম। তার মধ্যেই এই পত্রিকার প্রকাশ আমাদের কাছে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক। একদিন এই অন্ধকার কাটিয়ে আলোর দিশা দেখব আমরা। সকলকে শুভেচ্ছা।

পার্থ চক্রবর্তী
অফিস-সুপারিন্টেন্ডেন্ট

ছাত্রদের কলম

এই ভয়াবহ পরিবেশে আমরা আতঙ্কিত শঙ্কিত ছিলাম যখন, তখন অনলাইন পড়াশোনা শুরু করেছিল আমাদের কলেজ। স্যার-ম্যাডামরা যত্ন করে আমাদের ক্লাস নিয়েছেন, নিচ্ছেন। এর মধ্যেই আমরা প্রকাশ করতে পারলাম আয়ুস্, আমাদের কলেজের সাহিত্য পত্রিকা। সকলের চেষ্টায় এটি প্রকাশিত হল, তাই আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার, অন্যান্য স্যার-ম্যাডাম আর অফিসের সবাইকে আমাদের প্রণাম। ছাত্রছাত্রীবন্ধুদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা।

মৌসুমী দত্ত
অঙ্কুশা ঘোষ
ছাত্র প্রতিনিধি

কবিতার কথা

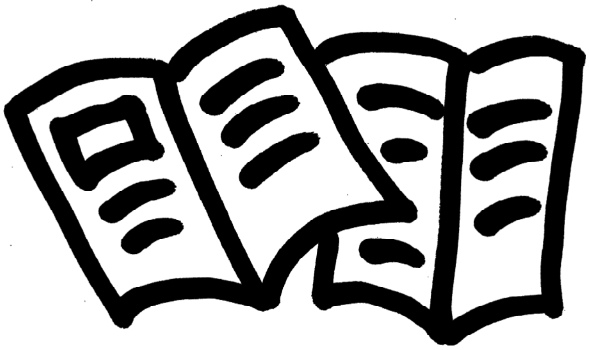

ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের মনের আবেগ
প্রকাশ করেছে কবিতার ভাষায় ...
তাদের নবীন উদ্যোগের সঙ্গে
কোনো কোনো কবিতায় সম্মিলিত
শিক্ষকের পরিণত ভাবনাও।

কবিতার কথা

বিচারে বিভ্রাট

রণজিৎ দাস
ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

চলছে বিচার আদালতে কাঠগড়াতে ষষ্ঠীচরণ।
কাচুমাচু মুখটি ভাবে আজ বুঝি তার নেহাত মরণ।।
বিচারপতি এবার নাকি অপরাধের দণ্ড দেবে।
রায় কী হবে দর্শকেরা সেই কথাটি পায় না ভেবে।।
কিছুক্ষণের মধ্যে বলেন ধর্মাবতার শুনুন সবাই।
মিথ্যা বলার অপরাধে কান দুটো ওর করব জবাই।।
এই আদেশে হুকুমনামা রাখেন তিনি নিজের হাতে।
ষষ্ঠীচরণ ভিরমি খেল দাঁড়িয়ে থেকে কাঠগড়াতে।।
কেউ-বা বলে ঠিক হয়েছে, বললে-বা কেউ ন্যায় বিচার।
হতচ্ছাড়া ষষ্টে ব্যাটা ভুলের পথে যাবে না আর।।
দোহাই হুজুর দয়া করুন ষষ্ঠী বলেন করুণ স্বরে।
কানদুটোকে কেটে আমায় দেবেন না স্যার অন্ধ করে।।
কান গেলে হয় অন্ধ নাকি মিথ্যে কীসব বকছ বাজে।
বিচারপতি বলেন বাধা দিচ্ছ কেন বিচার কাজে।।
হুজুর এটা মিথ্যে তো নয় — ষষ্ঠী বলে শুনুন তবে।
কান গেলে মোর মুণ্ডু থেকে, চশমা তবে কোথায় রবে।।
চশমাবিহীন চক্ষু আমার অন্ধ সে তো সবাই জানে।
অন্ধ করার চেয়ে আমায় একেবারেই মারুন প্রাণে।।

কবিতার কথা

দেবতা জীব

মৌসুমী দত্ত
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

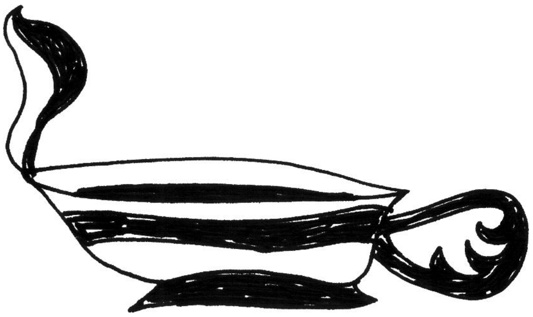

মন্দিরে নেই, মসজিদে নেই, গির্জাতে নেই প্রভু,
শ্মশানেও নেই, কবরেও নেই, গুরুদ্বারে নেই প্রভু।
তাঁহার আসন বিশ্বভুবন নিখিল জগৎ মাঝে,
তাঁহার আসন মানুষের মাঝে, মানুষের পান সাথে।
পুরোহিত মৌলবি পাদ্রির, মন্ত্র উচ্চারণে যাবে নাকো তারে পাওয়া,
অন্ধের গোঁড়ামিতে পাওয়া তো যাবে না তারে দেখা।
সবার মুক্ত ডাকায় তিনি আসেন সবার কাছে,
সবার প্রাণের মিলনেই তিনি দেখা দেন বারে বারে।
বর্ণেও নেই, অর্থেও নেই, জাতেও নেই প্রভু;
হিংসাতে নেই, ঘৃণাতে নেই, শোষণে নেই কভু।
পবিত্র তাঁর অমর প্রেমের শান্তির মাঝে তিনি;
তাঁহার প্রাণ যে কর্মের সাথে, জ্ঞানের আলোর মাঝে।
বিশ্ব মানুষ হাতে হাত ধরে বাঁচার পরে যে বলবে,
পেয়েছি দেবতা তোমায় আমি পেয়েছি তোমার জীবে।
মানুষের দেওয়া অমৃত পেয়ে বিশ্ব মানুষ বলবে,
পেয়েছি দেবতা তোমায় আমি পেয়েছি তোমার জীবে।

কবিতার কথা

গঙ্গোত্রী শোভা

পূর্ণিমা বিশ্বাস
ছাত্রী, বাণিজ্য বিভাগ

হে মা গঙ্গে
সেই আছি, গঙ্গোত্রী হতে এসেছিলে নেমে
শ্যাম বর্ণালী এ বঙ্গে
আজও আছ তুমি - আছে সেই রূপ
তোমার শীতল জলে ভরায়েছি বুক।
গাজনের দিনে আমি তোমার বুকে
মাতামাতি করি রঙ্গে
সম্মুখে ওই শ্মশানের চিতা
সেথা বসে আছে সকলের পিতা
আশ্রিত তার চরণের তলে
ধন্য হয়েছি মা তোমারই জলে।
সময় যে দিন মোর ফুরিয়ে যাবে
তোমার আমার ফের দেখা হবে।
সেদিন মা ভুল করে দিয়ো না ঠেলে
ভাবিও মা তোমারই হারানো ছেলে
নিয়ো তুলে, দিয়ো স্থান, অমর স্থানে
চিরকাল যেন থাকি হাসি আর গানে।

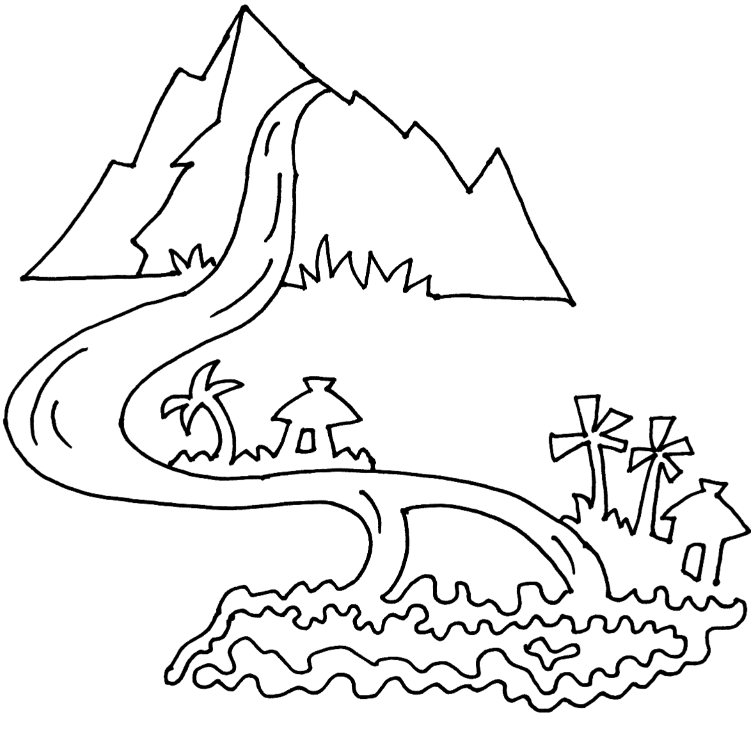

কবিতার কথা

দশচক্রে পিষ্ট কোনও এক বিপন্ন বিস্মিতের প্রতি

রমিতা সেনগুপ্ত

প্রাক্তন অধ্যাপক

মানুষের কাছে
পতনের সত্য কোনো কালে
সত্য হয়নি তো —
তবু ইতিহাস থাকে তারও
ইতিহাস আছে মানুষের,
মান - হুঁশেরই;
অঙ্গীকারবদ্ধ আমি থাকি তারই জন্মের প্রহরী।
তরঙ্গ উঠেছে দুলে রক্তের ভিতরে
ঘূর্ণি তার গাত্র বেদনায়
অন্ধকার, দৃষ্টি নেয়,
তবু চেতনায়
অন্য এক শুভদৃষ্টি হয়
পরিচয় পাই পৃথিবীর, মানুষের সময়ের
বৃক্ষের মতন বাঁচি
তাই প্রতীক্ষায় শুধু প্রতীক্ষায়।
কে জানে সত্যযুগ কবে সত্য হয়
কে জানে রাম বলে কেউ ছিল কি না কোনোদিনও
অযোধ্যাও সে অযোধ্যা ছিল কি কখনও?
তবুও তো বাল্মীকি রামায়ণ লেখে
রাবণের রণাঙ্গন তুচ্ছ করে মানুষের আশা
মানুষেরই কাছে।
আমাদের
আশা তো মরেনি
এখনও যে শঠতাকে ঘৃণা করি
ক্ষুব্ধ হই অন্যায় শাসনে
ভাত রাঁধি, হাসি কাঁদি, স্বপ্ন দেখি ..... আজও!

কবিতার কথা

আমরা তো পরাজিত নয়!
নয় নয় কখনোই নয়।
জেনো আজ শঠতার বলে
ক্রুর আত্মগর্বী
পৃথিবী জ্বালিয়ে গ্রহান্তরে গেছে
বিষবাষ্পগতি
আবার ফিরবে ঠিক ব্যুমেরাং হয়ে ...
এখন না-হয় থাক
কিছুদিন অ-বাক বিস্ময়ে
সপ্তর্ষি প্রশ্নের মত
মিথ্যারাই হোক সত্যি
রূপকথা হয় হোক মিছে
আরও সত্যি মানুষের বেদনা
সেঁধোক ভিতরে, আরো সেঁধোক ভিতরে
লজ্জা পেয়ে।
ধ্রুব জেনো শেষ নয়
সেটা শেষ নয়
বুকের ভিতরে আরও নূতন সত্যের খোঁজ
চলে তার শিকড়ে শিকড়ে
একদিন পল্লবিত হবে
আজকের এই বাঁচা
দুঃখের মূল্য শিখে আমার সন্তান
মানুষের জীবনের গান গাইবে।
আগামী দিনের কথা রূপকথা হবে
আমাদের বেদনার দানে।

কবিতার কথা

“তুমিই” তখন একা

নয়ন ভৌমিক
ছাত্র, বাংলা বিভাগ

বন্ধু আজ তোমরা মেতেছ রক্তের নেশায়
ধমনীর উষ্ণ রক্তের মতো আজ তোমাদের তেজ
উত্তাল সমুদ্রের মতো তোমরা ভয়ংকর
কালবৈশাখীর মেঘের মতো তোমাদের গতি।
কিন্তু শোনো বন্ধু, একদিন রক্তের তেজ যায় মরে
সমুদ্র হয় শান্ত
মুহূর্তের মধ্যে কালবৈশাখীর গতি হয় মন্থর।
সেদিন দেখবে তুমি,
পেছনের সাথী গেছে চলে।
খালি তুমি পড়ে আছ,
ভগ্ন শরীরে, একা, মুমূর্ষু হয়ে।

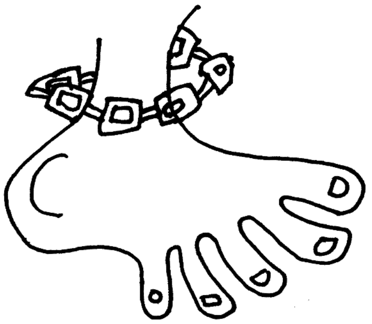

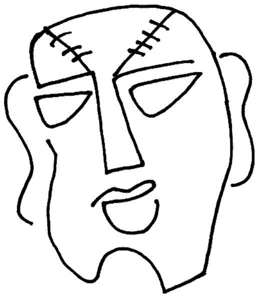

ব্যাকুল প্রার্থনা

শুভন দাস
ছাত্র, পদার্থবিদ্যা বিভাগ

সুদূর অতীতে কবে
মুনিবর বলে গেছে
“অন্নচিন্তা চমৎকার”।
আজও
সেই চিন্তা কুরে চলে
হৃৎপিণ্ড আমার
অহরহ।
হৃদয়ের অব্যক্ত ব্যথা
তোমাকেই সাথী করে
কেঁদে ফেরে
অযুত সংসারে।
কবে
ব্যর্থ, মিথ্যা হবে
তোমার অমোঘ বাণী
ক্রন্দসী জননী
রুটি দাও, অন্ন দাও
বলিবে না —
স্নেহাতুর পুত্রার্থে।

কবিতার কথা

নির্ভাবনার মনের কথা

অর্কজিৎ ব্যানার্জি
ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

চন্দ্র সূর্য দেবতা আছে
আইন সরকার ধর্ম আছে
তবু বলছ শান্তি নাই
ভয় কি তোমার আছে ভাই!
ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদছে শিশু
বেচছে শরীর হাজার হাঁসু
কোটি বেকারের মিথ্যে আশা
করের বোঝা হচ্ছে খাসা।
বাড়ছে দাম দিনকে দিন
গুনছে গরিব মরার দিন
আসছে অকাল আকাশ জুড়ে
উঠছে শোষক পাতাল ফুঁড়ে।
কালো টাকারই জমছে পাহাড়
ঋণের বোঝা হচ্ছে ভার
মহাজনেরই সুদের দায়ে
যাচ্ছে জমি তাদের পায়ে।

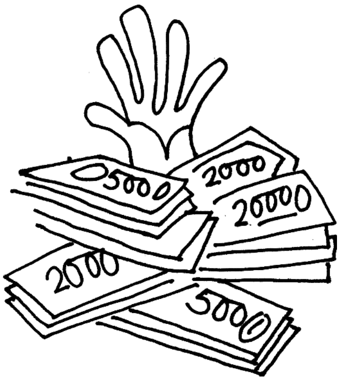

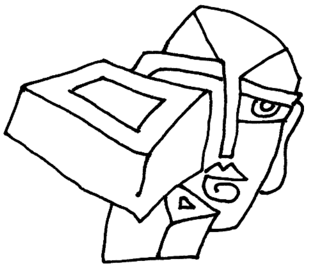

সব কিছু ভাই দেখে-শুনে
থাকবে তুমি আপন মনে
নিজের জ্বালা গোপন করে
রাখবে হাসি মুখটি ভরে!
মনের জ্বালা লুকিয়ে রাখো
প্রতিবাদটি করো নাকো
নইলে দেখবে আইন আছে
জেলের দরজা কত কাছে।
অনেক ভেবে করেছি ঠিক
আমার কাজের দুটো দিক
সব অন্যায় মেনে নেওয়া
সময় হলে ভোটটি দেওয়া।
আমার পেটে ক্ষুধা থাকুক
তোমার ছেলে জ্বরে কাঁপুক
সরকারের তবু আয় বাড়ুক
সমাজতন্ত্রের বুলি ছাড়ুক।

কবিতার কথা

কাজের মেয়ে

গৌতম মণ্ডল

ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

ক্যানিং লাইনে কালিকাপুর
অনেকেরই শোনা —
ভোরের আলো না ফুটতেই
তাদের আনাগোনা,
কলকাতারই বুকে।
তখন নিদ্রাসুখে
শহরের এই মানুষগুলো,
ঢাকুরিয়া যাদবপুরের
ইস্টিশনের কুকুরগুলো
এ পাশ থেকে ও পাশ ফিরে
অলস চোখে দেখে।
দৌড়ে যদি যেতে পারে
সকাল সকাল দুটো বাড়ি,
দুধের লাইন আর বাসনমাজা
সারতে হবে তাড়াতাড়ি।
কাপড় কাচা ঘর মোছাতে
একটুখানি দেরি হলে
দেড়টার ট্রেন ফেল হবে তার
কাঁদবে যে তার কোলের ছেলে।

বছর দেড়েক বয়স যে তার
দুধের আশায় বসে আছে,
ন'বছরের বড়ো দিদি
মায়ের মতো বসে কাছে।
কান্না থামায় —
ফ্যানটা ঝেড়ে ভাতটা নামায়,
হাতটা যে তার পুড়িয়ে ফেলে,
রান্না করে শাকের আঁটি
কান্না ভেজা চোখের জলে।
মা আসলে তবেই ছুটি
খেলবে সে যে পুতুল নিয়ে
ঘোড়ায় চড়ে বর আসবে
আজ পুতুলের হবে বিয়ে।।

কবিতার কথা

টাকার মহিমা

মেঘা সিং
ছাত্রী, শিক্ষা বিভাগ

টাকা-টাকা-টাকা ভাই টাকার কথা বলছি।
টাকার জোরেই এই দুনিয়ায় আমরা সবাই চলছি।
বাতাসেতে উড়ছে টাকা, যে পারছে সে লুটছে।
কেউ-বা আবার অর্থাভাবে পায়ে মাথা খুটছে।
টাকায় আসে বন্ধুত্ব, টাকায় আসে সম্মান,
কেউ-বা তাকে ধরতে গিয়ে, খাচ্ছে কেবল লোকসান।
তবুও আবার সেই টাকারই পিছু ধাওয়া করছে।
টাকার তরে দিবারাত্রি জীবন মরণ লড়ছে।।
কেউ-বা আবার প্রচুর টাকায় গাড়ি কিনে ঘুরছে,
কেউ-বা আবার অর্থাভাবে খিদের জ্বালায় জ্বলছে।।
লেখাপড়া নাই-বা শেখ, নাই-বা নিলে শিক্ষা
থাকলে টাকা সবাই তোমার মন্ত্রে নেবে দীক্ষা।।
টাকা ছাড়া এই দুনিয়ার কোন্ জিনিসটা চলছে।
বেশি টাকা থাকলে আবার কালোবাজারি বলছে।
টাকা ছাড়া সবই অসাড়, টাকার ভীষণ শক্তি।
করছে খুন, টাকার জোরে পাচ্ছে কেবল মুক্তি।
পৃথিবীটাই শেখে টাকার বশীভূত মন্ত্রে।
গোটা দেশটা চলছে টাকার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে।।

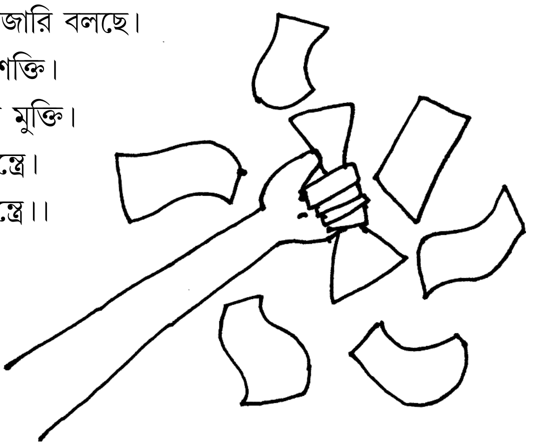

কবিতার কথা

আমরা

শিখা মধু
ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

কেন চুপ করে আছ নিপীড়িত মানুষের দল?
আমাদের ভয়ে কাঁপে ওই শোষক শ্রেণির দল।
আমরা গরিব, আমরা কুলি, আমরা দরিদ্র;
সমাজের সকল কাজ আমাদের কাছে ক্ষুদ্র।
আমরা গড়ি সমাজ, আমরা গড়ি বাড়ি,
এই সমাজের মধ্যে যত থাকেন নর-নারী।
আমাদের দানে বেঁচে আছে ওই যত পুঁজিপতি,
তাদের পায়ে করছ কেন কাকুতি-মিনতি?
আমরা যদি রুখে দাঁড়াই শোষকদের বিরুদ্ধে;
তবে ওরা থাকতে পারে এই সমাজের মধ্যে?
মনে আন বল, মোছ চোখের জল,
ওদের আসনকে করে দাও টলমল।
সবাই মোরা এক সাথে রাখব হাতে হাত,
আমরা ওই শোষকদের করব পদাঘাত।
ওদের দূর করে, নূতন সমাজ গড়ে,
থাকব মোরা ঘরে সমান অধিকারে।

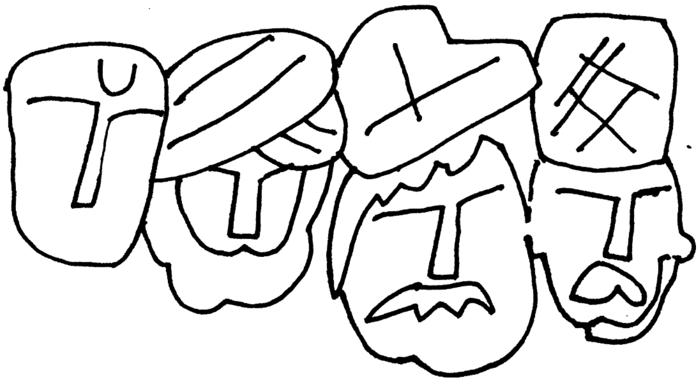

কবিতার কথা

সংহতি

আলমগীর মণ্ডল
ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

এই দেশেতে অনেক মহান পুরুষ
লিখে গেছেন মহাকাব্য
কোন্ কাব্যে লিখেছেন জাতপাতের বাক্য?
ওরা মানুষ আমরা মানুষ —
মুখে করি বড়াই
তবুও জাতপাতে হেন কোন লড়াই?
রক্ত এক দেহ এক, দেশ সবার
সমস্যা সমাধান প্রেম প্রীতিতে প্রতিকার।
দেশকে বলি মা, সকল ভারতীয়
মাকে ভাগ করে যে, নয় সে ভারতীয়।
দশে মিলে করি কাজ, হই তথাতা
হাটাও মুখোশ ধারীদের আর বর্বরতা
হিন্দু, খ্রিস্টান, শিখ ও মুসলমান সকল আমার ভাই
ধন্য আমি ধন্য তুমি ধন্য সকল ভাই।

লেকটাউনের ছড়া

তিয়াসা ঘোষ
ছাত্রী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বহুদিন আগে নাকি
লেক টাউনে লেক ছিল
একটা মেয়ে লেকের জলে
কী যেন সব দেখছিল।
দেখছিল না খুঁজছিল
আপন মনেই বুঝছিল,
জলের ভেতর ছায়ার সাথে
হয় তো নিজেই যুঝছিল।
আদৌ কোনো লেক ছিলো?
(নাকি) লেকের মতোই ঠেকছিল?
আজ নেই সে দিঘির জলে
পঞ্চদশীর নিস্তার
শ্যাওলা পানায় টই-টুম্বুর
মশক কুলের বিস্তার।

কবিতার কথা

একুশ আমার পরিচয়

নাহিদা সুলতানা
ছাত্রী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বয়স আমার একুশ
বয়সটাই আমার পরিচয়।
রক্তে উন্মাদনার স্রোত
দেহে অসুরের শক্তি
মনে অসীম সাহস।
তবু, বৃথাই মনে হয় এই ক্ষণিকের লব্ধ গুণগুলোকে
এর, একটার প্রয়োগ যথাযথ নয় এই বয়সে।
মুখের ভাষাগুলোও আজ কেমন এলোমেলো হয়ে যায়,
ঠোঁটের কোণে না-বলা কথাগুলো মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে,
বিদ্রোহী মন আজ পরাজিত হতে চায়,
নিষ্পলক চোখ দুটি চায় সুন্দরের সেবা করতে,
বারুদের গন্ধ অপেক্ষা কোমল হৃদয়ের স্পর্শ,
আজ আমাকে বেশি বিচলিত করে,
বয়সের চশমায় আজ সব কিছুই রঙিন আমার চোখে,
এ সবই একুশেরই অবদান।
'বয়স আমার একুশ
বয়সটাই আমার পরিচয়।'

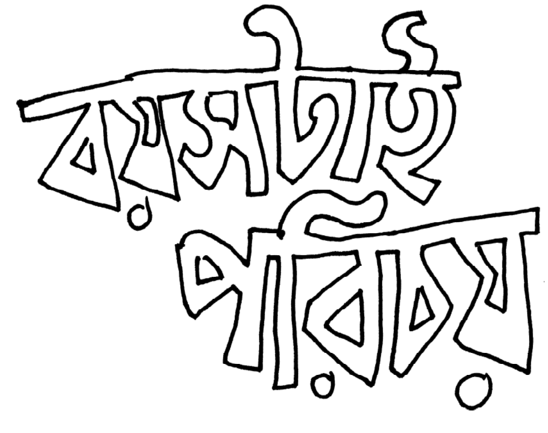

কবিতার কথা

মাটির কান্না আর বাঁচার লড়াই

অনির্বাণ ঘোষ
ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

আমাদের মা কাঁদছে
পায়ের নীচের মাটিগুলো কাঁদছে
তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?
সবুজ প্রাণভরা গাছগুলো কাঁপছে
নবীণ মধুঝরা ফুলগুলো কাঁদছে
তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ?
সরস মাটি শুকিয়ে চৌকাঠ হয়ে গেছে
প্রাণদায়ী জলের স্তর নেমে গেছে অনেক নীচে
বিবেকের নাগালের বাইরে।
তবু চোখ ধাঁধানো দালানগুলো দাঁড়িয়ে আছে,
মন মাতানো গানের ফোয়ারায়
রঙিন মানুষগুলো নেচে মরছে।
রঙিন জল রঙিন আলো
রঙে রঙে ভরপুর
বিশ শতকের সোনালি স্বপ্নভেলায়
উদ্দাম রুধির।

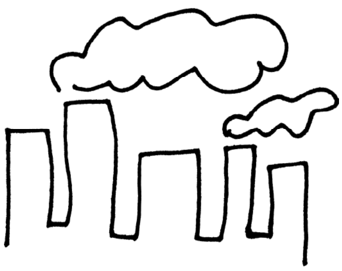

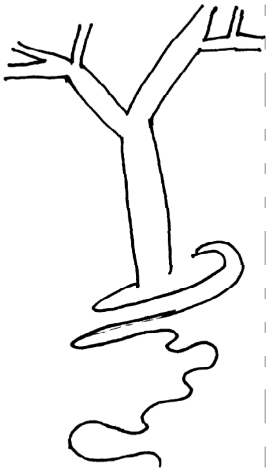

আর —
পাশের গলিতে গলিত শব।
কিংবা —
ছিন্ন-বস্ত্রা মায়ের কোলে
অনাহারে ক্লিষ্ট শিশুটা ধুঁকছে
ডাস্টবিনের এক ফালি রুটির দখলের লড়াইয়ে।
নেড়ি কুত্তাটাই জিতে গেল।
সৃষ্টির গোড়া থেকে চলছে বাঁচার লড়াই
অ্যামিবা থেকে ডাইনোসর
ফুল থেকে ফল
লতা থেকে পাতা
কিংবা বনমানুষ থেকে বানর মানুষ
কেউ থেমে নেই।
আলো-আঁধারের ফাঁকে ফাঁকে শুধু চলছে লড়াই
এ লড়াই — বাঁচার লড়াই।

কবিতার কথা

স্বাধীনতার মহানায়কদের উদ্দেশে

ঈশিতা তালুকদার
ছাত্রী, ইতিহাস বিভাগ

মাঝে মাঝে বইয়ের পাতায় তোমাদের ছায়া দেখে চমকে উঠি।
তোমরা কী না করেছ আমাদের জন্য, তাই তো
বইয়ের পাতায় আঁকা আছে তোমাদের
উনিশশো সাতচল্লিশের আগের ছবি।
অবিকল যেন ধরা রয়েছে আয়নায়।
এখন আমাদের বয়স কত নবীন
আর তোমাদের বয়স কত প্রবীণ।
তাই তো আমাদের সঙ্গে লুপ্ত
করে দিচ্ছ তোমাদের ব্যবধান।
এই তো বাগানের চারাগুলোর পরিচর্যা শুরু করেছি
রোদ্দুর থেকে বাঁচানো, জল ঢালা, নিড়ানোর কাজ,
ফুল ফোটাতে, ফল ধরাতে, প্রতীক্ষা আর
প্রত্যাশা নিয়ে, দৈনন্দিন কাজের পসরা।
তোমাদের এ সব শেষ,
এমনকি ফসল তোলাও, হয়তো হিসাব মেলানো
তবু দ্যাখো ভালো লাগে
উনিশশো সাতচল্লিশের আগে তোমরা
আমাদের মতো নবীন ছিলে।

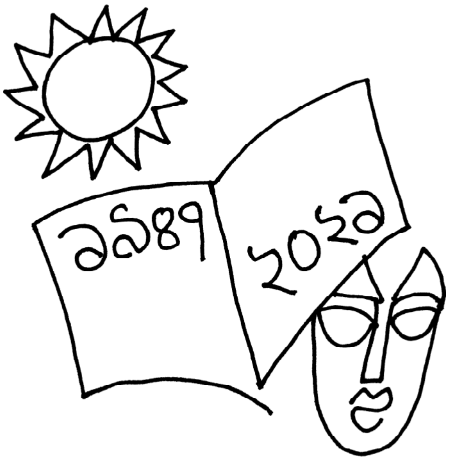

কবিতার কথা

ফেরারি কৈশোর

অরুণাভ সিংহ
অধ্যাপক, বাণিজ্য বিভাগ

আমার একটা জংলা নদী চাই
আমার চাই একটা পাহাড় নীল
চোখ ধোয়ানো কিছুটা রোদ্দুর
আরো খানিক তারার ঝিলমিল।
আমার চাই মেঘ ছোঁয়ানো ঘুড়ি
তার সাথে চাই চিলেকোঠার ছাত
পুরোনো সেই আড়-বাঁশিটাও চাই
অনেক অনেক গল্প বলা রাত।
আমার সেই হজমি'য়ালাও চাই
বয়াম পেতে সেই যে বাজার মোড়
চৌধুরীদের কালো জামের গাছ
বুকের মধ্যে জাগালো কৈশোর।।
আমার সেই ছুটির দুপুর চাই
মেঘ-মুলুকে যেমন ছিল চিল
হাতের মুঠোয় চাই দুরন্ত দিন
ঝিলের জলে ব্যাঙ-লাফানি ঢিল।
আমার সেই বিকেলগুলোও চাই
ঘাসে ঘাসে সবুজ খেলার মাঠ
'আপোন-বাপোন' উঠোন খুঁজে যাই
অনুভবে ছুঁয়েছি চৌকাঠ।
আবারও সেই পলাশ বেলা চাই
রাঙা আগুন আবির লেখা ঘোর
আমার খানিক নির্জনতাও চাই
খুঁজব তবে হারানো কৈশোর।।
কোথায় গেছে টিনের সে সুটকেস
মফসস্‌লীর ছোট্ট সে ইশকুল
ড্রইং খাতায়, রংচঙে প্যাস্টেল
ভুগোল মিস, ভুলিনি এক চুল।
আমার সেই সাইকেলটা চাই
প্যাডেল টেনে দিগন্তে বাই বাই
যেই চাকাতে বড়ো হবার শুরু
তাতেই আমি ছোট্টবেলা চাই।
কোথায় গেল অমল সে শৈশব
বুকের মধ্যে মেঘ জমেছে ঘোর
আমার চাই ফেরারি সব দিন
আমার চাই হারানো কৈশোর।।

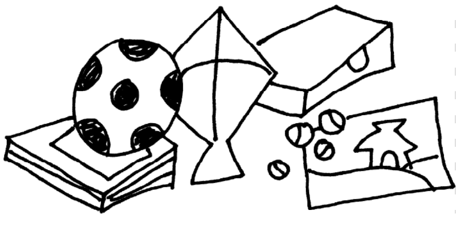

Smile and Smile

Abdul Sahidar Dhali
Dept. of Commerce

Wake up with a smile,
For you have to go many a mile,
Before you reach your destination,
So full of joy and fascination.

Be courageous and never fear,
Only then, you will become dear.
This world is full of pain and sorrow,
Wake up with a smile for a better tomorrow.

Fasten your belts and set out for travel
With determination you will never fail.
But always remember to wake up with a smile
For you have to go many a mile.

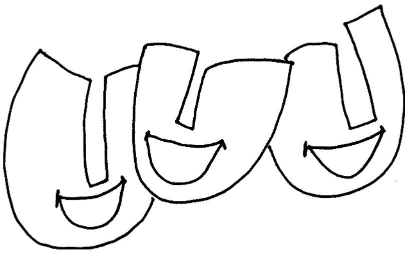

LEAFLESS
TREE
HEARTLESS
VOICE

Life, Love and Art

Prof. Farid Mondal
Dept. of English

The sky is no more blue,
Smoke all around;
Blind Sun and disceased Moon !
Is it true ?
Leafless trees, grey skeleton
The morning is dark;
Pale and withered rose, stale evening,
Headless is Man !
Groaning everywhere, in the market
A Devil is found
Almost covering the entire air,
Mascular left hand,
Heartless, thundering voice,
Grinning with bloody face –
Eating Man and Humanity,
Every hour and day !
Lets get free, over the trees,
Like honeybees –
Better roam at fancy fresh,
Leaving red, rotten surface
Airy .... fairy ....!
But the crash !!

কবিতার কথা

सारे जहां से अच्छा इण्डिया हमारा

इन्द्रजीत यादव
छात्र, वाणिज्य विभाग

सारे जहां से अच्छा इण्डिया हमारा।
हम भेड़-बकरी इसके यह गड़ेरिया हमारा।।
सत्ता की खुमारी में आजादी सो रही।
हड़ताल क्यों है इसकी पड़ताल हो रही।
सारे जहां से अच्छा इण्डिया हमारा।।
चोरों-घुसखोरों परनोट बरसते है।
ईमान के मुसाफिर, राशन को तरसते है।
वोटर से वोट लेकर, वे कर गए किनारा।
सारे जहां से अच्छा इण्डिया हमारा।।
हिन्दी के भक्त है हम जनता को जताते है।
लेकिन बेटे को अपने कान्वेंट में पढ़ाते है।।
फिल्मों पर फिदा लड़का, फैशन पर फिदा लड़की।
मजबूर माता-पिता के जेब में छाई कड़की।
जेवर उड़ाकर बेटा, मुम्बई को भागता है।
जीरो है लेकिन खुदको हीरा से नापता है।।
रंगीन सपनों पर किस्मत ने ठोकर मारा।
सारे जहां से अच्छा इण्डिया हमारा।

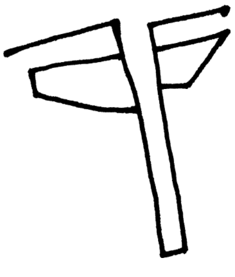

इक्कीसवीं सदीका झरोखा

शम्पा पान्डा
छात्रा, इतिहास विभाग

इक्कीसवीं सदी के बच्चे, अक्ल में न होंगे कच्चे।
बढ़ो से ठेंगा दिखलाकर देते रहेंगे गच्चे।
इक्कीसवीं सदीकी नारी, होगी मर्दों पर भारी।
पहनेगी कोट और पैंट, उतर जायेगी साड़ी।
इक्कीसवीं सदी का पति, पत्नी के साथ होगा सती।
करवा चौथ का व्रत करेगा, सदा सुहागा होकर रहेगा।
इक्कीसवीं सदी के शिष्य, कक्षा में रहेंगे उदृश्य,
हाथों में होंगी उनके कोक, मुंह से बोलेंगे श्लोक।
गुरु टी.वी., गुरु सी.डी, गुरुदेवो कंप्यूटर
गुरु साक्षात तश्मौ श्रीरिमोटाय नम:।
इक्कीसवीं सदी के नेता, देश का करेंगे पलीता
जनता को मार मार, खुद बनेंगे विजेता।

প্রবন্ধ নিবন্ধ

নানা ভাবনার বর্ণালী।
সিনেমা থেকে পোস্টার শিল্প
আবার সামাজিক চেতনা থেকে
মজাদার রম্য ভাবনা!

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

পথের পাঁচালী সিনেমা নির্মাণের নেপথ্য কাহিনি

অধ্যাপক দেবযানী নায়ক
বাংলা বিভাগ

সারা পৃথিবীতে চলচ্চিত্রের অঙ্গনে খ্যাতিমান কয়েকজন চলচ্চিত্র নির্মাতার মধ্যে একজন বাঙালির নাম সন্দেহতীতভাবে উচ্চারিত হত। তিনি এমনই এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যিনি বাংলা চলচ্চিত্র তো বটেই, এমনকি পুরো উপমহাদেশের চলচ্চিত্রকেও এক ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন — কিংবদন্তি এই মানুষটি হলেন সত্যজিৎ রায়। ১৯২১ সালের ২ মে কলকাতা শহরে সাহিত্য ও শিল্পসমাজে খ্যাতনামা রায় পরিবারে সত্যজিৎ রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পিতা সুকুমার রায় এবং পিতামহ উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী দুজনেই ছিলেন বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি সত্যজিতের অনেক পরিচিতিকে ম্লান করে দিয়েছে। সংগীতকার, চলচ্চিত্রকার, চিত্রনাট্যকার, অলংকারশিল্পী বিবিধ লেখক এইরকম, বিশেষণে তাঁকে ভূষিত করা গেলেও সত্যজিতের প্রথম এবং শেষ পরিচিতি তিনি চলচ্চিত্র পরিচালক। ভারতের একমাত্র অস্কারজয়ী কখনও প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের লেখা নিয়ে, কখনও-বা নিজের কাহিনি, চিত্রনাট্যের উপর ভর করেই সিনেমা বানিয়েছেন। কিন্তু কখনোই তিনি

বাণিজ্যকে সর্বস্ব করে সিনেমা তৈরি করেননি। তাই তাঁর সব ছবিতেই আছে রুচিশীল নান্দনিক ভাবনা। তিনি আঠাশটি সিনেমা, পাঁচটি তথ্যচিত্র এবং দূরদর্শনের জন্য তিনটি ছবি বানিয়েছেন। এ ছাড়া অন্যের ছবিতে বিজ্ঞাপন চিত্রে তিনি কখনও চিত্রনাট্যকার, কখনও-বা ধারাভাব্যকার হিসেবে কাজ করেছেন। তিনি হচ্ছেন দ্বিতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, যাঁকে বিভিন্ন সময়ে নানা পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়। ১৯৯২ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সস (অস্কার) তাঁকে আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করে। মৃত্যুশয্যার এই পুরস্কার হাতে নিয়ে তাঁর সরস উক্তি প্রমাণ করে মৃত্যু শিয়রে উপস্থিত হলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি জীবনকে পুরোপুরিভাবে উপভোগ করেছিলেন।

যে সময় সত্যজিৎ রায় কাজ করেছেন সেইসময় দূরদৃষ্টি ছাড়া ছবি বানানো অসম্ভব ছিল — একালের মতো সেকালে বৈভব ছিল না। চিত্র পরিচালনা, গল্প-চিত্রনাট্য-সংলাপ-গান রচনা, সংগীত পরিচালনার পাশাপাশি পোস্টার ডিজাইন ও স্টোরিবোর্ডিং, কাস্টিং ও পোশাক পরিকল্পনাও করেছিলেন। ইংরেজ চলচ্চিত্র সমালোচক রবিন উড মনে করতেন তাঁর ছবির যে-কোনো দৃশ্য নিয়েই একটি গোটা নিবন্ধ লিখে ফেলা যায়। ইতালিয়ান পরিচালক ভিত্তোরি দ্য সিকার বানানো নিও রিয়েলস্টিক ‘লাদ্রি দি বিচিক্লেডে’ (ইংরাজিতে ‘দ্য বাইসাইকেল থিফ’) ছবিটি দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে সিনেমা বানানোর স্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন এই বাঙালি তরুণ — সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিভূতিভূষণের কালজয়ী উপন্যাস ‘পথের পাঁচালী’ নিয়ে প্রথম চলচ্চিত্র তৈরি করবেন।

১৯৪৫ সালে একদিন সিগনেট প্রেসের প্রধান ডি কে গুপ্ত তাঁকে ডেকে ‘আম আঁটি ভেঁপুর’ প্রচ্ছদসহ ভেতরের ছবিগুলো আঁকতে বলেছিলেন। সত্যজিৎ তখনও পথের পাঁচালী পড়েননি, তিনশো পৃষ্ঠার মূল বইটি পড়ে অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন ‘অপূর্ব’। তারপর পাঁচ বছর পেরিয়ে গেলেও মনের ভেতরে গেঁথে যাওয়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উপন্যাসটির কাহিনি তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে শুরু করেছিল। ১৯৫০ সালে লেখকের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী রমাদেবীর কাছ থেকে সত্যজিৎ উপন্যাসটির স্বত্ব কিনে নিয়ে সিনেমা বানাতে শুরু করেছিলেন। বিভূতিভূষণের মনেও এই উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়নের বাসনা ছিল। শহরে বেড়ে-ওঠা মানুষের কাছে গ্রামীণ জীবনের গাছ থেকে ফল পেড়ে খাওয়া, ঝড়ের দিনে আম কোড়ানো, পুকুরে একসঙ্গে স্নান করা, নানান উৎসবে পাড়া ঘুরে বেড়ানো — এই অভিজ্ঞতাগুলো একেবারে অচেনা — তার সুখানুভূতি পথের পাঁচালী চলচ্চিত্রটি দেখে অনুভব করা যায়। বিভূতিভূষণ নিজের জীবন থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উপন্যাসটি লিখেছিলেন। লেখকের পিতা পুরোহিত ছিলেন এবং গানের গলা বেশ ভালো ছিল, তাঁর মা গ্রামের মেয়ে ছিলেন যদিও নিজের কোনো বোন ছিলো না। তবে লেখকের এক পিসতুতো বোনের সঙ্গে দুর্গার চরিত্রের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। তাঁদের সঙ্গে একজন বৃদ্ধ পিসিও থাকতেন। বিভূতিভূষণ — সত্যজিতের পথের পাঁচালী শিখিয়েছে দেশ মানে পতাকা আর ম্যাপ নয়, দেশ মানে ঘরের হাঁড়ি-কুড়ি, নারকোল মালা, রাংতা থেকে ঘাস-জল-মাঠ-বর্ণ পরিব্যাপ্ত এক সংসার।

সত্যজিৎ রায় চরিত্রগুলোর জন্য উপযুক্ত শিল্পী খুঁজতে শুরু করেছিলেন। অপুর বাবা হরিহরের জন্য মঞ্চ-নাটকের কানু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠিক করা হয়। অপু চরিত্রের জন্য পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন দিলেও মনের মতো কাউকে পাননি। অবশেষে বিজয়া রায় তাঁর বাড়ির পাশের ছাদে সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়কে খেলতে দেখেন। তাকেই অপু চরিত্রের জন্য মনোনীত করা হয়। কিশোরী দুর্গার জন্য উমা দাশগুপ্তকে এক বন্ধুর মাধ্যমেই খুঁজে পান। সর্বজয়ার চরিত্রের জন্য তাঁর বন্ধু নিজের স্ত্রী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু করুণা মঞ্চ নাটকে কাজ করলেও সিনেমাতে কাজ করতে প্রথমে রাজি হননি। পরবর্তীকালে সত্যজিতের অনুরোধে সম্মতি

দিয়েছিলেন। ইন্দির ঠাকরুনের চরিত্রের জন্য অভিনেত্রী নির্বাচন সত্যিই অভিনব ছিল। নামকরা বিদেশি কোম্পানির গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের নিশ্চিন্ত চাকরি ছেড়ে সেইসময় দীর্ঘাঙ্গী এক ভদ্রলোক হন্যে হয়ে খুঁজছেন তাঁর প্রথম ছবির জন্য এক বৃদ্ধাকে। কিন্তু কিছুতেই মনের মতো পাওয়া যাচ্ছে না। বিভূতিভূষণ লিখে গিয়েছিলেন,

> ‘‘পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, গাল তোবড়াইয়া গিয়াছে, মাজা ঈষৎ ভাঙিয়া শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে ...।’’

নবীন পরিচালকের ঠিক এমনটাই দরকার। অবশেষে কলকাতার পতিতাপল্লির ভাঙা দাওয়ায় খোঁজ মিললো পরিচালকের সেই পরশপাথরের। সত্যজিতের ইন্দির ঠাকরুন হয়ে উঠলেন অশীতিপর চুনীবালা দেবী। যৌবনে থিয়েটারে অল্পস্বল্প অভিনয় করেছিলেন। তিনিই হয়ে উঠলেন দিগ্বিজয়ী সিনেমার ইতিহাস-তৈরি-করা চরিত্র। শিশু দুর্গার জন্য রুনকি বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্ন শিক্ষকের চরিত্রের জন্য তুলসী চক্রবর্তী এবং মিঠাইওয়ালার জন্য হরেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে মনোনীত করা হয়। তা ছাড়া অন্যান্য বিভিন্ন অনুল্লেখ্য চরিত্রে বড়াল গ্রামের বাসিন্দারা অভিনয় করেন।

এইভাবেই একদিন শুরু হয়ে গেল ‘পথের পাঁচালী’-র শুটিং। কলকাতার উপকণ্ঠের বোড়ালকে সত্যজিৎ বানিয়ে নিলেন বিভূতিভূষণের পাতায় লেখা নিশ্চিন্দিপুর গ্রাম। সে যেন এক্কেবারে উঠে এসেছিল লেখকের কলম থেকেই। সেই বাঁশবন, সেই পুকুরপাড়, কাশবনের ধারে রেললাইন, জমিদার বাড়ি আর সর্বজয়ার তুলসীতলা। সেখানেই বইয়ের পাতা থেকে জীবন্ত হয়ে উঠলেন ইন্দির ঠাকরুন। মাত্র ২০ টাকা রোজের মাইনে, এর থেকে বেশি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না সত্যজিতের। নিজের অসাধারণ সাবলীল অভিনয় দক্ষতায় সত্যজিৎকে অভাবের কথা ভুলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। একটা শর্ট ছিল—। নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে খাচ্ছেন ইন্দির ঠাকরুন। আর হাতে রুপোলি জরি পাকাতে পাকাতে তা হাঁ করে দেখছে ছোটো দুর্গা। সেই শর্ট এতই ভালো আর সাবলীল হল যে কাট বলতেই ভুলে গেলেন মানিক। ১৯৫৫ সালের ২৬ আগস্ট ছবি মুক্তির আগেই চুনীবালাদেবী মৃত্যুবরণ করেছিলেন। জানতে পারলেন না, তিনিই প্রথম ভারতীয় অভিনেত্রী যিনি বিদেশি চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কৃত হয়েছেন — ম্যানিলা চলচ্চিত্র উৎসবে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁকে ছাড়া তৈরিই হত না ‘পথের পাঁচালী’।

পথের পাঁচালী আমাদের চিরচেনা গ্রামবাংলারই কোনো এক প্রান্তে একটি নিম্নবিত্ত পরিবারের জীবন কাহিনি, যেখানে বিভূতিভূষণ পরিবারটির হাসি-কান্না, স্বপ্ন আর সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন অবিশ্বাস্য নিপুণতায়। বাংলা সাহিত্যিকদের মধ্যে গ্রামীণ সমাজ আর শিশু মনকে একইসঙ্গে তাঁর মতো অবলীলায় তুলে ধরতে আর কেউ বোধ হয় পারেননি। উপন্যাসটি শুধু পল্লিবাংলার অকৃত্রিম প্রতিচ্ছবিই নয়, উপরন্তু তার বুকে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ছেলেমানুষী হাসি-কান্নার দিনলিপিও। আর সেই অনন্যতার স্বরূপই সত্যজিৎকে আকৃষ্ট করেছিল। তিনি উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করে যে-ছবি করেছিলেন, তার মহত্ত্ব মূল লেখাটিকেও ছাপিয়ে গিয়েছিল। তবে জানেন কি সত্যজিৎ যখন তাঁর প্রথম ছবি ‘পথের পাঁচালী’ পরিচালনা করতে গিয়েছিলেন তখন তিনি জানতেন না ছবির জন্য আলাদা করে স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে হয়। সেটে সবাই শ্যুটিংয়ের জন্য যখন রেডি, তখন সহ-পরিচালক এসে তাঁর কাছে স্ক্রিপ্ট চাইলে তিনি বলেন,

> ‘‘স্ক্রিপ্টের কী দরকার? আমি যা বলব ওরা তাই করবে, তাই বলবে। আলাদা করে স্ক্রিপ্টের কী দরকার?’’

সবাই তো একথা শুনে হাঁ। তারপর তিনি বলেছিলেন,

“ঠিক আছে পেন আর কাগজ নিয়ে এসো। আমি লিখে দিচ্ছি।”

সেইমতো তিনি ছোটো কাগজের টুকরোতে একটা করে দৃশ্য এঁকে দিলেন এবং কে কী কথা বলবে তা তখনই বসে লিখে দিলেন। এই চিরকুটগুলোই ছিল ‘পথের পাঁচালী’-র চিত্রনাট্য। এর থেকেই বোঝা যায় তিনি ছিলেন কালজয়ী পরিচালক। মাথায় পুরো বিষয়টা এমনভাবে গেঁথে নিতেন যে তাঁর কোনো কিছুরই দরকার পড়ত না।

গল্পের প্রত্যক্ষ দাবিকে কিছুটা ভুলে ডিটেল-এর অন্য ব্যবহার তিনি করেছেন। একটি দৃশ্যের কথা স্মরণ করা যাক — হরিহরের ভিটেয় প্রথম সন্ধ্যার দৃশ্য — প্রথমে দেখি, দিন শেষ হয়ে আবার আলো নেভার পর্ব, প্রান্তর থেকে ক্রমশ গুটিয়ে ক্যামেরা উঠে এল উঠোনে, দাওয়ায়। প্রথমে শেষ বিকেলের আলো, দুর্গা আর অপু মাঠ থেকে ফিরছে রাঙী গাইকে সঙ্গে নিয়ে। আকাশে কালো মেঘের চাদর ছিঁড়ে উকি দিচ্ছে শেষ সূর্য, বাড়ির দেওয়াল, তারপর উঠোন। থিম সংগীত মিলিয়ে গিয়ে ভেসে আসে পল্লি থেকে উঠে আসা শাঁখের আওয়াজ। উঠোনে, তুলসীতলায় প্রণাম করতে আসে একে একে ইন্দির ঠাকুরন, সর্বজয়া প্রণাম করে চলে যায়। এরপর অন্ধকার আরও ঘণীভূত হয় বাড়ির দাওয়ায়। ... সর্বজয়া গৃহস্থালীর কাজে ব্যস্ত, ক্যামেরা বাবা আর ছেলের উপর এগিয়ে যায়। পাশের দাওয়ার দৃশ্যে দুর্গাকে দেখা যায়, ইন্দির ঠাকরুণ এসে যোগ করে। .... দূর থেকে ভেসে আসে ট্রেনের শব্দ, ক্যামেরা অপুর দিকে এগিয়ে যায়, সে অন্ধকারের দিকে চেয়ে শুনছে সেই শব্দ। — গোধূলি থেকে সন্ধ্যা হয়ে রাত্রিতে গড়িয়ে যাওয়া এই দিনটিই এই দৃশ্যের বিষয়। এই দৃশ্য শুধু দৃশ্য থাকে না, সে যেন রক্তমাংসের সজীব চরিত্র হয়ে উঠে — অসাধারণ চিত্রনাট্যের উপস্থাপনা করা হয়েছে।

পথের পাঁচালী সবদিক থেকেই উন্নতমানের চলচ্চিত্র — বিশেষ করে ছবির আঙ্গিক একেবারেই অতুলনীয়। গ্রিফিথ বেটোফেনের সংগীত থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন একথা তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। ‘ভারতকোষ ৩য় খণ্ড’-এ প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর চিত্রনাট্যটি। এই সিনেমাটি মুক্তির পর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি নির্মাতা সত্যজিৎ রায়কে। ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেছেন। ‘পাত্তা না পাওয়া’ এক সিনেমা-পাগল তরুণের দিকে দৃষ্টি পড়েছিলো সবার। ‘পথের পাঁচালী’ মুক্তির পর দেখা গেল তাঁর পেছনে ছুটেছে ভারতের সবচেয়ে নামীদামী প্রযোজক সংস্থাও। সিনেমা নির্মাণের জন্য পরবর্তীকালে তাঁকে আর অর্থকষ্টে পড়তে হয়নি। জগদ্বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎকে জানতে হলে তাঁর ভেতরের চিত্রকরটিকেও চিনতে হবে। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের সমস্যা থাকায় নির্মাণকার্য ব্যাহত হয় এবং দীর্ঘ তিন বছর পরে তা সম্পূর্ণ হয়। সেই সময় তাঁর অর্থাভাব এত প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে পরিচালককে তাঁর ব্যক্তিগত পুঁজিও বিক্রি করে দিতে হয়। স্বল্প বাজেটে সরকারি লোন নিয়ে অপেশাদার অভিনেতা ও অনভিজ্ঞ শিল্পীদের নিয়ে এই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়। সেতারবাদক রবিশঙ্কর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের রাগ ব্যবহার করে এই চলচ্চিত্রের সংগীত নির্মাণ করেন। সুব্রত মিত্র চিত্রগ্রহণ ও দুলাল দত্ত সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ৩ মে নিউইয়র্ক শহরের মিউজিয়াম অব মডার্ন আর্টের একটি প্রদর্শনীতে চলচ্চিত্রটি মুক্তি পায় ও পরে সেই বছর কলকাতা শহরে মুক্তি লাভ করলে দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে।

সিনেমার সূচনায় দেখা যায় নিশ্চিন্দিপুর গ্রামে হরিহর রায়ের সংসারে থাকেন তাঁর স্ত্রী সর্বজয়া, তার মেয়ে দুর্গা, ছেলে অপু আর দুর্গার বুড়ো পিসি। ভাঙাচোরা দালানের মধ্যেও বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় এককালে

প্রতিপত্তি ছিল এ বাড়ির। দুর্গা বাগান থেকে লুকিয়ে পেয়ারা নিয়ে আসে। সর্বজয়ার কথা থেকে বুঝতে পারা যায় সেই বাগানও একদিন তাদেরই ছিল। ধারের অর্থ শোধ না করার জন্য সেজো খুড়ি লিখিয়ে নিয়েছে। সর্বজয়ার ভালো লাগে না অভাব-অনটনের জীবন, আর ভালো লাগে না হরিহরের দূর সম্পর্কের দিদি ইন্দির ঠাকুরনকে। সর্বজয়ার কথা সহ্য করতে না পেরে সে প্রায়ই ভিটে ছাড়ে। অপুর বড়ো হয়ে ওঠা, পাঠশালায় যাওয়া, পণ্ডিত মশাইয়ের চাল বিক্রি করতে করতে পড়ানো, গ্রামের চন্দ্রপুলিওয়ালাকে দেখে দুর্গার মিঠাইয়ের জন্য লোভ, তার গ্রাম জঙ্গলে চষে বেড়ানো — এইসব ছোটো ছোটো নিঁখুত দৃশ্যের বুননে পথের পাঁচালী আঁকা হয়। আর যা পুরো সিনেমাটিকে ধরে রেখেছে তা হল নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি — এই সিনেমায় প্রকৃতি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি চরিত্র হয়ে প্রকাশিত হয়; যার হাতেই থাকে পথের পাঁচালীর দিক পরিবর্তনের সমস্ত শক্তি।

সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণের উপন্যাসটিকে কেন্দ্র করেই একের পর এক দৃশ্য জুড়ে প্রকৃতির দুর্নিবার ক্ষমতা সৃষ্ট করে তুলেছিলেন। যে আলো-ছায়া ক্যামেরার লেন্স দিয়ে বন্দি করেছেন, তার মাঝেই জেগে ওঠে পিচ্ছিল মেঠো পথ। বন্দি করেন এক নিরবিচ্ছিন্ন সময়-জোড়া এক রহস্য-নিবিড় প্রকৃতিকে, যা সকল চরিত্রকে ছাপিয়ে বেশিরভাগ ফ্রেম জুড়ে থাকে। অথচ সে নীরব — বৃষ্টির শব্দে, এক অজানা গুঞ্জনে যে শব্দ তা এক অসীম ব্যাপ্তি নির্মাণ করে। যে ফ্রেমে প্রকৃতি আর দৃশ্যমান থাকে না, সেখানে অফ স্ক্রিন সাউন্ড তার বিরাট ব্যাপ্তিকে ফুটিয়ে তোলে। প্রকৃতি তার তীব্র রূপ নিয়ে জেগে থাকে দিগন্ত-বিস্তৃত কাশ জঙ্গলের মাঝে, অপুর ট্রেন দেখার ফাঁকে। অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঝরে পড়ে, যে বৃষ্টি কিছুতেই ধরে না দুর্গাকে কাছে না টেনে নেওয়া পর্যন্ত। সিনেমা যখন শুরু হয় তখন ছোটো দুর্গা বনপথ দিয়ে হেঁটে যায়, সেই প্রকৃতি ছিল শান্ত। আর যে রাতে দুর্গার মৃত্যু ঘটে, সেই রাতে ঘর-দুয়োর-উঠোন তোলপাড় করে প্রকৃতি যেন ভেঙে পড়তে চায়। দুর্গার মৃত্যুর রাতে বন্ধ ঘরের মাঝেই প্রকৃতির সেই ভয়াবহতাকে অফ স্ক্রিন সাউন্ড দিয়ে তার মুভমেন্টকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় হল হরিহর, সর্বজয়া, অপু বা দুর্গার কথা বলার ধরন। অজস্র সংলাপ ছাড়াই সত্যজিৎ অপুর গল্প বলে যান। সেই কম কথাই অপু চরিত্রকে গড়ে তোলে। সে সবকিছুকে খুব গভীরভাবে অনুভব করে, তার ডাগর চোখ মেলে সবকিছু দেখে। পাঠশালার পণ্ডিতমশায়ের আচরণ, রাতের যাত্রাপালা আর তার দিদি দুর্গার ব্যথাতুর চোখ কিছুই এড়িয়ে যায় না তার শিশু চোখে। আর তার শরীরে আছে এক অদ্ভুত ছন্দ — ট্রেন দেখতে যাওয়ার জন্য তার দৌড়ের মাধ্যমে তা প্রকাশ পায়।

সাউন্ডের প্রসঙ্গে অপূর্ব আবহসংগীতের কথা বলতে গিয়ে পণ্ডিত রবিশঙ্করের যন্ত্রানুষঙ্গের কথা আসে — সারা সিনেমা জুড়ে সেই মায়া। দুর্গার মৃত্যুর পর হরিহরের সর্বজয়াকে করা প্রশ্ন শোনা যায় না, বিরাটভাবে বেজে ওঠে সংগীত। নীরবতা এক অপূর্ব আবহসংগীতের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে নিয়ে যায় পথের পাঁচালীকে, দাঁড় করিয়ে দেয় গভীর সব প্রশ্নের মুখোমুখি — তখন সিনেমাটি কাব্যের মাত্রা পায়।

অপুর প্রথম ট্রেন দেখার অভিজ্ঞতা দুর্গার সঙ্গেই। কালো ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার দৃশ্যে অপুর চোখে-মুখে অবাক বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে। দৃশ্যটিতে দেখা যায় অপু কাশবনের মাঝখান দিয়ে দুর্গাকে খুঁজতে থাকে। সুবীর ব্যানার্জি এই দৃশ্যটি ফুটিয়ে তুলতে পারছিল না — তার হাঁটা মোটেই স্বাভাবিক নয় আড়ষ্ট। কী করা যায় ভাবতে ভাবতে সত্যজিতের মাথায় একটা বুদ্ধি এল। খানিক পরপর তিন সহকারীকে এদিক-ওদিক দাঁড় করিয়ে দিলেন — নির্দিষ্ট সময় অন্তর-অন্তর সুবীরকে তাঁরা নাম ধরে ডাকবেন। যেদিক থেকে ডাক আসবে,

সুবীর সেদিকে তাকাবে — দাঁড়ালে চলবে না। পথের উপর এদিক-সেদিক ফেলে রাখা হয়েছিল শুকনো ডাল, পাথর — সেসব লাফিয়ে পার হতে হবে সুবীরকে। এবার আর ভুল হয় না। সহজাত অভিনয় প্রতিভা নেই এমন এক ছেলের অনিশ্চিত ভঙ্গির হাঁটা দিয়ে শুরু হয় নতুন এক ইতিহাসের প্রথম পা ফেলা।

মৃত্যু ‘পথের পাঁচালী’ উপন্যাসের পিছু ছাড়েনি, ছড়িয়ে পড়ে বইয়ের পাতায় পাতায় এবং সিনেমার বিভিন্ন দৃশ্যে। ইন্দির ঠাকরুনের অকালমৃত মেয়ে বিশ্বেশ্বরীই যেন দুর্গা হয়ে ফিরে আসে, আর সেটাই হয়ে দাঁড়ায় ইন্দির ঠাকরুনের প্রতি সর্বজয়ার ঈর্ষার কারণ। জীবনের চরম সত্যকে খুব কঠিন অনুভবে অথচ খুব কাব্যিকভাবে প্রকাশ করেছিলেন সত্যজিৎ রায় — সেই সত্য হল মৃত্যু। সিনেমার প্রথম দিকে একটা গান শোনা যায় — ‘‘হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে’’ — ভাঙা দালানে চাঁদনী রাতে যখন আলো-অন্ধকারে একা গলায় গানটি গেয়ে ওঠে ইন্দির ঠাকুরন। তখন বোঝা যায় মৃত্যু ঠিক জীবনেরই কাছে বাস করে। সেই অপার্থিবতায়, সেই আকুতিতে অন্ধকারে মানুষ পারানির ডাক শুনতে পায়। ইন্দির ঠাকরুনের মুখের অজস্র ভাঁজে যেন বারবার জীবন মৃত্যুর মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা এক বিস্ময় খেলা করে যায়। মৃত্যুর আগে দালানে এসে ঘটিতে করে জল খায় ইন্দির আর ঘটির অবশিষ্ট জলটুকু চারা গাছটিকে ঢেলে দেয়। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের প্রতি তার যে ভালোবাসা, আর মায়া স্পষ্ট হয়ে ওঠে — সত্যজিতের সেই ডিটেলিং-এর ক্ষমতা দর্শককে চমকে দিয়ে যায়। বাড়ি ফেরার পথে ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যুকে অপু ও দুর্গা খুব কাছ থেকে দেখেছিল — সেটিই অপুর প্রথম কাছের মানুষের মৃত্যু অভিজ্ঞতা। ইন্দির ঠাকরুণ অসাধারণ অভিনয় করেছেন এই দৃশ্যে। মূল উপন্যাসে ইন্দির ঠাকরুনের মৃত্যু হয় আরেক প্রতিবেশীর বাড়ির মণ্ডপে। কিন্তু সত্যজিতের মনে হয়েছে বাঁশ বাগানের মাঝে অপু আর দুর্গার ইন্দিরের মৃতদেহ আবিষ্কার করাটা অন্য রকম একটি মাত্রা সংযোজন করবে। ইন্দির ঠাকরুন মৃত্যুর আগে যখন শেষবারের মতো ভিটেয় আসে, তখন সর্বজয়ার ব্যবহার, তার ইন্দির ঠাকরুনের দিকে তাকিয়ে দেখা ও না-দেখার যে কাহিনি চলে — তার মধ্যে এক অদ্ভুত শীতলতা ফুটিয়ে তোলেন সত্যজিৎ রায়। মৃত্যুর দৃশ্যে যখন ইন্দিরের মাথা গড়িয়ে পড়ার কথা, তখন ছুটে গিয়ে চুনীবালার মাথা নিজের কোলে নিয়ে নিয়েছিলেন সত্যজিৎ। বৃদ্ধার রসবোধও কম ছিল না — বাঁশের খাটিয়ায় যখন ইন্দিরকে নিয়ে যাওয়ার শট ‘ওকে’ হল, তারপরেও চোখ মেললেন না চুনীবালা। সবাই যখন চিন্তায় পড়ে গিয়ে ডাকাডাকি শুরু করেছে, তখন পিটপিট করে তাকিয়ে এক গাল হেসে চুনীবালা বললেন, ‘‘আমি তো ভাবছি শুটিং এখনো চলছে।’’

দুর্গা যেন জানে তার মৃত্যুর কথা — সারা সিনেমা জুড়ে সে বলে যায়, ‘তার কোনোদিন বিয়ে হবে না’, তার সখীর বিয়ের দিন তার দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। দারিদ্র্য আর নিরানন্দ যেন তাকে গভীরভাবে বুঝতে শিখিয়েছে যে জীবন তার জন্য নয়। সত্যজিৎ সেই বেদনা বয়ে বেড়ান তাঁর সিনেমায়, দুর্গার এই চরিত্র চিত্রণে। ইন্দির ঠাকুরনের মৃত্যু থেকে দুর্গার মৃত্যুর যে সময় এই সিনেমাতে তা খুব অল্প। মৃত্যু যে এ বাসায় ঢোকে আর ছাড়তেই চায় না। রেলগাড়ি দেখার ইচ্ছে যে কিশোরীর, বিয়ের আশায় যে ছোট্ট একটি চারাগাছকে পুজো করে, তার তো অদম্য কামনা বেঁচে থাকার। চরম প্রাণশক্তি যে কিশোরীর, যার উদ্দামতার ছন্দ পুরো সিনেমাকে ধরে রেখে দেয়। সে যেন জানে আনন্দের ভোগ আর তার জীবনে নেই। প্রবল বৃষ্টিতে ভিজে ক্রমে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত দুর্গা ফুটো চাল দিয়ে পড়া বৃষ্টিতে রাতভর ভিজতে থাকে। তার ফলেই বিনা চিকিৎসায় সে মারা যায়। দুর্গা মারা যাওয়ার পর অপু এক বাদলা দিনে বাড়ি থেকে বেরোয়, কিন্তু উঠোনে নেমেই আকাশের দিকে সে তাকায়, আজ সে অল্প মেঘকেও ভয় পায়। যে অপু দিদির সঙ্গে জলে ভিজে ‘লেবু পাতায় করমচা / এই বৃষ্টি ধরে যা’ শুনতো, সে আজ আর ছেলেমানুষি ছড়ায় বিশ্বাস করে জীবন কাটায় না। দুর্গার মৃত্যু তাকে যেন নিঃসঙ্গ

করে তুলেছিল।

পথের পাঁচালী সিনেমা নির্মাণের পশ্চাতে অনেক অজানা তথ্য আছে —

- এই সিনেমা নির্মাণের মাঝপথে টাকার অভাবে শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধান চন্দ্র রায়ের উদ্যোগে বাকি অর্থ পাওয়া গিয়েছিল। তবে সেটাও খুব সহজে হয়নি। ওই সময়ে রাজ্য সরকারের অনেকেই একে ডকুমেন্টরি ধরনের হবে বলে মন্তব্য করেছিলেন। শেষ পর্যায়ে এই টাকাটা সড়ক ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় হিসেবে পাবলিক রেকর্ডে তুলে সত্যজিৎকে দেওয়া হয়েছিল।
- দীর্ঘ পাঁচ বছরের নির্মাণযজ্ঞে অন্তত তিনটি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা ছিল, যা ঘটলে এই ছবির সকল প্রচেষ্টাই মুখ থুবড়ে পড়ত। এক, যদি অপুর কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হতো; দুই, চুনীবালা দেবী (ইন্দির ঠাকুরণের চরিত্রের অভিনেত্রী শিল্পী) যদি মৃত্যুবরণ করতেন এবং তিন, দুর্গা যদি বড়ো হয়ে যেত। বলা বাহুল্য এই তিনজনেরই বয়স এমন একেকটি পরিণতির দিকে যাচ্ছিল।
- এই সিনেমার শুটিংয়ের আগে সত্যজিৎ রায় কখনো কোনো চলচ্চিত্র পরিচালনা করেননি। সুব্রত মিত্রর এর আগে চিত্রগ্রাহকের কাজ করেননি। তাছাড়া সিনেমার জন্য ব্যবহৃত ১৬ মি.মি. লেন্সটিও সত্যজিৎ অন্য একজনের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। চলচ্চিত্রের শিশুশিল্পীদের অভিনয় করানোর পূর্বে একবারও স্ক্রিনটেস্ট করানোর কথা ভাবা হয়নি।
- এই ছবির জন্য বরাদ্দ অর্থ সংগ্রহ করতে গিয়ে সত্যজিৎ একসময়ে অনেকগুলি দুর্লভ রেকর্ড, নিজের জীবনবীমা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। স্ত্রী বিজয়া রায় তাঁর গহনা বন্ধক রেখেছিলেন।
- এই সিনেমার পুরো চিত্রনাট্য পরিচালক তৈরি করেননি। তাঁর বিভিন্ন চিত্রকর্ম এবং নোট থেকে অনেক সংলাপ নির্মিত হয় এবং দৃশ্য সংগ্রহ করা হয়।
- সর্বজয়া এবং ছোট দুর্গার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রুনকি বন্দ্যোপাধ্যায়। বাস্তব জীবনেও তারা মা ও মেয়ে ছিলেন।
- সুবীর ব্যানার্জির বাবা প্রথমে রাজি ছিলেন না যে তাঁর পুত্র সিনেমায় অপু চরিত্রে অভিনয় করুক। তখন সত্যজিৎ তাঁকে বুঝিয়েছিলেন, ‘‘আজ আপনার সন্তানকে বা আমাকে কেউই চেনে না। কিন্তু আমি এমন একটি সিনেমা বানাব যা গোটা বাংলা সিনেমার ইতিহাস বদলে দেবে। তখন গোটা বাংলা আমাদের দুজনকেই চিনে নেবে।’’

  সত্যজিতের কণ্ঠস্বরে সত্যিই আত্মবিশ্বাস ছিল। পথের পাঁচালী সিনেমা নির্মাণ করে সত্যিই তিনি ইতিহাস রচনা করেছিলেন।
- সঙ্গীত পরিচালক পণ্ডিত রবিশঙ্কর চলচ্চিত্রের মিউজিক কম্পোজিশনের জন্য সর্বপ্রথম সিনেমা দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। বলা যায় তিনিই ছিলেন এই ছবির সর্বপ্রথম দর্শক। সিনেমাটি দেখে চমৎকৃত হয়ে একদিনেই টানা ১১ ঘন্টার মধ্যে সব রেকর্ডিং শেষ করেন।
- সত্যজিতের আমন্ত্রণ পেয়ে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সিনেমাটির প্রিমিয়ারে গিয়েছিলেন। অভিভূত হয়ে সেই মুহূর্তেই তিনি কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটি পাঠানোর বন্দোবস্ত করেন। অনেক সিনেমা সমালোচক এর বিরোধিতা করেছিলেন, কিন্তু নেহরুজি সবকিছু উপেক্ষা করেন। কান

চলচ্চিত্র উৎসবে পথের পাঁচালী প্রদর্শিত হওয়ার পূর্বে জুরি বোর্ডের সামনে আরো চারটি সিনেমা দেখানো হয়েছিল। সেখানে পথের পাঁচালী 'বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট' হিসেবে বিবেচিত হয়।

- সত্যজিৎ রায় সিনেমাটির অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে যখন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের সিদ্ধান্তের আশায় দিন গুনছিলেন তখন একদিন তাঁর শয়নকক্ষের জানলায় একটি সাদা প্যাঁচা এসে বসেছিলো। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে সাদা প্যাঁচাকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়, কারণ সাদা প্যাঁচা মা লক্ষ্মীর বাহন। প্যাঁচাটি এক টানা তিনদিন জানলায় বসেছিল, কোনোভাবেই উড়ে যাচ্ছিল না। সত্যজিতের স্ত্রী বিজয়া রায় তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থতে এই বিষয়ে লিখেছিলেন, ''এটি কোথা থেকে এলো, কোথায় বা হারিয়ে গেলো কেউই কিছু জানতে পারিনি।''
- ১৯৯৩ সালের এক অগ্নিকাণ্ডে এই ছবির মূল নেগেটিভ নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। পরবর্তীকালে নষ্ট ফিল্মকে ডিহাইড্রেটেড সঙ্গে, স্ক্যান আর রিপেয়ারিংয়ের মাধ্যমে 'ফোর-কে' রেজ্যুলেশন দেওয়া হয়। বর্তমানে বিভিন্ন মাধ্যমে যে পথের পাঁচালী ছবিটি দেখা হয় তা মূলত ওই রিপেয়ারড ফিল্ম।

[পথের পাঁচালী নির্মাণের পশ্চাতের অজানা তথ্যের উৎসসূত্র : হিন্দুস্থান টাইমস, এনডিটিভি, দি টাইমস অব ইন্ডিয়া, 'আমাদের কথা' (বিজয়া রায়ের আত্মজীবনী)]

সহায়ক গ্রন্থ :

বিষয় চলচ্চিত্র — সত্যজিৎ রায়
আমাদের কথা — বিজয়া রায়

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

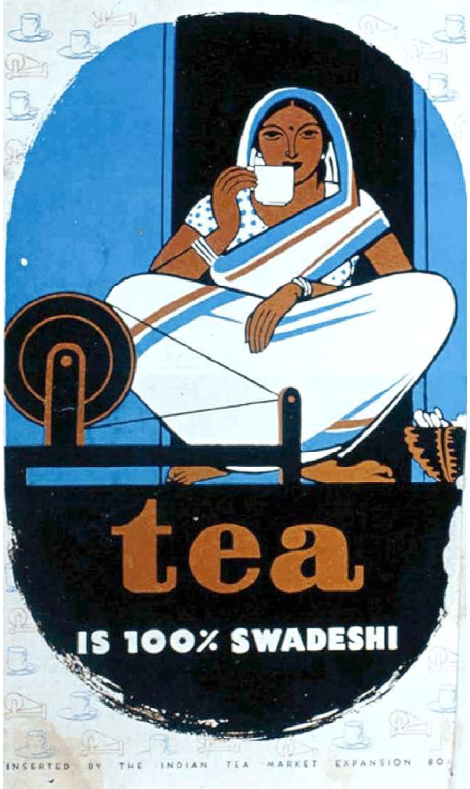
tea
IS 100% SWADESHI
INSERTED BY THE INDIAN TEA MARKET EXPANSION BO

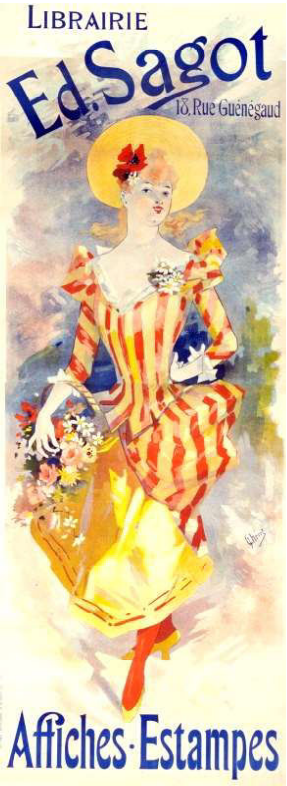
LIBRAIRIE
Ed. Sagot
18, Rue Guénégaud
Affiches-Estampes

পোস্টার শিল্পের কয়েকটি ধাপ

নিহিত মল্লিক
ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

বিজ্ঞাপনের যুগ বিংশ শতকে 'পোস্টার' শব্দটি অত্যন্ত পরিচিত। কারণ বর্তমানের বাণিজ্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা অটুট রাখার একটি বড়ো হাতিয়ার হল এই পোস্টার। আজকের দিনে কোনো রাজনৈতিক প্রচার, কোনও শিল্প বা পণ্যের জনপ্রিয়তার মূলেও থাকে ঐ একটি বস্তু 'পোস্টার'। শহরগুলোকে তো বটেই, প্রত্যন্ত গ্রামগুলোকে পর্যন্ত 'পোস্টার' বেঁধেছে আষ্টে-পিষ্টে। কিন্তু ব্যাপারটি আমাদের দেশের নিজস্ব নয়, অন্তত তার বর্ত্তমান চেহারা নিয়ে 'পোস্টার' শিল্প কখনোই ভারতবর্ষের মাটি থেকে উৎপন্ন হয়নি। অবশ্য আমাদের দেশে বৌদ্ধযুগে শ্রমণরা কাঠের ফলকের মাথায় বুদ্ধদেবের জীবনী ও জাতকের কাহিনি অবলম্বনে আঁকা ছবি সেঁটে সাধারণ মানুষকে সে সব ছবি দেখিয়ে বেড়াতেন বৌদ্ধধর্মকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার জন্য। কিন্তু সেসব ছবি formally পোস্টারের কিছুটা কাছাকাছি হলেও বাণিজ্যিক লেনদেনের কোনো গন্ধ তাতে ছিল না, তাদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম প্রচার।

পোস্টার তার আজকের চেহারা নিয়ে জনমানসকে প্রভাবিত করতে শুরু করে ইংরেজ আমল থেকে এবং ধনতান্ত্রিক পাশ্চাত্যের মাটিই পোস্টার শিল্পের জন্মস্থান। প্রাচীন গ্রিসে ও রোমে ব্যবসায়ী সমাজ পণ্যদ্রব্যের বিক্রি বাড়ানোর জন্য উঁচু কাঠের খুঁটিতে বা দোকানের গায়ে নজর কাড়ার মত জায়গায় দ্রব্যসামগ্রীর লোভনীয়তা গুণাবলি ইত্যাদি লিখে রাখত। কিন্তু সেসব ছিল নিছক বাণিজ্যিক প্রচার; তাই ইতিহাসের প্রথম স্তরে 'পোস্টার' তার আভিধানিক অর্থের যথার্থতা বজায় রাখলেও (কারণ 'পোস্টার' কথাটির অর্থ হল কোনও post বা খুঁটির গায়ে আটকানো কোনও বিশেষ বক্তব্য যা জনসমক্ষে আনার জন্য ওইভাবে রাখা হয়) 'শিল্প' হয়ে ওঠেনি।

১৪৭৭ সালে ইংল্যান্ডে ছাপাখানার প্রবর্তক উইলিয়ম ক্যাক্সটন তাঁর প্রকাশিত বইগুলির বিজ্ঞাপন দেবার জন্য ছাপা পোস্টারের প্রচলন করলেন। কিন্তু ক্যাক্সটনের পোস্টারগুলিও ছিল শুধু শব্দেরই সমন্বয়, তাতে ছবি ছিল না। লিথোগ্রাফির আবিষ্কার প্রথম রঙিন ছবিকে ছাপা পোস্টার হিসাবে ব্যবহৃত হতে সাহায্য করে। এতে পোষ্টারের প্রচলন ও জনপ্রিয়তা যেমন বাড়তে থাকে, তেমনি পোস্টার তার আধুনিক চেহারা নিয়ে শিল্প হবার পথে এগোয়।

প্রথম পোস্টারকে শিল্পের স্তরে উন্নীত করেন ফরাসি চিত্রশিল্পী জ্যুল সেরে। তৎকালীন প্যারিসের বিভিন্ন থিয়েটার, মিউজিক হল, রেস্তোরাঁ আরও অসংখ্য সংস্থার প্রচার ও জনপ্রিয়তা হয় সেরের হাতে আঁকা তাঁর নিজস্ব লিথোগ্রাফিক প্রেস থেকে ছাপা পোস্টারে। এর মধ্যে ফোলি বাজারের পোস্টারটি হয়তো কেউ কেউ দেখে থাকবে। জ্যুল সেরের পোস্টারগুলির লাইন ড্রইং অত্যন্ত জোরালো, রং আকর্ষণীয় ও উজ্জ্বল, ফর্ম ও সরল এবং ছবির সঙ্গে অল্প লিখিত বক্তব্য (শব্দাক্ষরে) মিশিয়ে সেখানে একটা অভিনব Visual impact তৈরি হয়েছিল। আধুনিক পোস্টার ফর্মটির গোড়াপত্তন এইভাবে ফরাসি দেশেই হয়। সেরের হাতে 'পোস্টার' হল যন্ত্রযুগের "রাস্তার ম্যুরাল" এবং শিল্প স্পষ্টাস্পষ্টি বাণিজ্যিক শক্তির আজ্ঞাবাহী প্রচার যন্ত্র হয়ে দাঁড়াল।

এর মধ্যে প্রাচ্যে পোস্টার শিল্পের প্রবর্তন দেখা গিয়েছিল চিনে ও জাপানে। এই দেশের শিল্পীরা রঙিন কাঠ খোদাই করে অপূর্ব সুন্দর কিছু থিয়েটারের পোস্টার তৈরি করেন, যার শিল্প-মূল্য আজও শিল্পরসিকদের অত্যন্ত আদরের। এই জাপানি কাঠ খোদাই পোস্টার সেরের পরবর্তী পোস্টার শিল্পী তুলুস লোত্রেককে দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। লোত্রেকের পোস্টারে জাপানি কাঠ খোদাই রীতির সঙ্গে ফরাসি আর্ট ন্যুভোর সমন্বয়ে অনবদ্য শিল্প গড়ে উঠেছে। লোত্রেকের অসংখ্য পোস্টারগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত মূল্য রুজে লা গুলুয়ের নাচের পোস্টার। একটা মজার ব্যাপার হল এই যে লোত্রেক পেটের দায়ে শিল্পকে বাণিজ্যিক প্রচার যন্ত্র হিসাবে খাটালেও তাঁরই ব্যবহৃত রঙের মধ্য থেকে তাঁর মতো শিল্পীকে নিষ্পেষণ করা বাণিজ্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ক্ষয়িষ্ণু গ্লানিকর রূপটা বেরিয়ে আসে। এইখানে নিঃসন্দেহে লোত্রেকের 'পোস্টার' শিল্প যেহেতু তার মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজের সত্যরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর একটি ব্যাপার খুব লক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে যেহেতু ফ্রান্স দেশটি ভোগের ও ভোগীর সেহেতু ফরাসি দেশেই শিল্পকে ভোগের দরবারে হাজির করে পোস্টার শিল্পের বিস্তৃতি হয় পূর্ণতম। কারণ পোস্টার প্রথম থেকে শিল্পকে ভোগের বাজারে পণ্যের মতো বিক্রি করতে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে মাতিস, বোনার্ড এমনকি পিকাসোর মত শিল্পীও জীবিকার তাগিদে পোস্টার এঁকে বিজ্ঞাপন ধর্মী ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাটতি বাড়িয়ে গেছেন। কিন্তু তাতে লাভ হয়েছে একটাই, প্রচারমুখী ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের শিল্পরুচির উন্নতি ঘটেছে : ব্যবসায়িক পোস্টারও যে কত সুন্দর হতে পারে তার নিদর্শন প্যারিসের মেট্রো স্টেশনের দেওয়ালে আঁটা পোস্টারগুলো! আমাদের দেশেও কমার্শিয়াল পোস্টারের উপর বেশ ভালো কাজকর্ম হয়েছে, তার মধ্যে এয়ার ইন্ডিয়ার পোস্টারগুলির (যেগুলি সারা বিশ্বের বিভিন্ন বিমান সংস্থার পোস্টারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হয়েছে) নাম উল্লেখযোগ্য।

কিন্তু বর্তমানকালে 'পোস্টার' শুধু পোস্টার মাত্র নয়, 'আর্ট পোস্টার' কথাটি এখন বহুল প্রচলিত এবং আধুনিক শিল্পধারার এটি নিঃসন্দেহে একটি সম্ভাবনাময় দিক। ১৯ শতকের শেষদিকে বেশ কিছু শিল্পী ভালো ভালো আর্ট পোস্টারের কাজ করেন। এঁদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের অব্রে বিয়ার্ডস্লে, উইলিয়াম নিকলসন ও জেমস প্রাইড, ম্যাকিনটস্, আমেরিকার উইল ব্র্যাডলে, উইলিয়াম ক্রাকভিল, সুইজারল্যাণ্ডের স্টেনলাইন, বোহেমিয়ার মুকা, বেলজিয়ামের ক্রিসপিন, অস্ট্রিয়ার মোশের, হল্যান্ডের টুরোপ, ইটালির মাট্যালনি প্রমুখ বিখ্যাত। 'আর্ট পোস্টার' পোস্টারের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে, কারণ এখানে শিল্পী বা শিল্প কোনও মুনাফালোভী শক্তির আজ্ঞাবহ দাস নয় বরঞ্চ ওই শক্তির বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদই সে এই মাধ্যমে সবার কাছে রাখতে পারে। পোস্টার শিল্পের এই গণতান্ত্রিক সম্ভাবনাগুলো খুলে দেওয়ার কাজে পিকাসোর অবদান যথেষ্ট। শোষণের নগ্নরূপ উদ্ঘাটিত করে জনমানসে তৎকালীন সময় সম্পর্কে সচেতনতা আনার উদ্দেশ্যে ''গ্যেরনিকা'' প্রভৃতি ছবিগুলো প্রকৃতপক্ষে পোস্টারধর্মী।

এদেশেও মূলত মনভোলানো শিল্পের বিপণনশক্তির উমেদারি করার উদ্দেশ্যে পোস্টারের প্রবর্তন হয়। বটতলার কাটা বাংলা কাঠের টাইপে ছাপা এইসব পোস্টার ছিল প্রধানত থিয়েটারের বিজ্ঞাপন। গিরিশ ঘোষের নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হত এইরকম সব পোস্টারে। কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্বার্থপ্রণোদিত এই সমস্ত পোস্টারে কোনও শিল্পরুচি ছিল না। বাংলাদেশে পোস্টারকে প্রথম শিল্পস্তরে তুলে নিয়ে আসেন নন্দলাল বসু। গান্ধিজির ডাকে ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসে নন্দলাল বসু যান মণ্ডপশিল্পী হিসাবে এবং মণ্ডপের বাইরের দেওয়ালে এঁকে আসেন তাঁর অতুলনীয় সৃষ্টি ''হরিপুরা পোস্টার''। এই পোস্টারগুলির একটি বিশেষত্ব এই যে এখানে লেখার ব্যবহার মোটে করা হয়নি কারণ এদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিরক্ষর গ্রামবাসী আর একটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে যথার্থ সংযোগ গড়ে তোলা। তাই গ্রামবাসীদের পরিচিত ঘরোয়া গ্রাম্যজীবনই হয়েছিল এইসব পোস্টারের বিষয়বস্তু। একজন সচেতন ও দরদী শিল্পীর হাতে পড়ে চারুশিল্প সেই প্রথম তার বিচ্ছিন্ন প্রকোষ্ঠ থেকে নেমে এসে জনমানসের সহমর্মিতা অর্জন করে সার্থক হয়।

এরপরেও আমাদের দেশে পোস্টারের কাজ অনেক হয়েছে। নন্দলালের প্রায় সমকালীন ভোলা চ্যাটার্জির বলিষ্ঠ রেখাঙ্কনে মূলত সাদা কালো রঙে আঁকা নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের মুখ নিঃসন্দেহে একটি নাম করা পোস্টার। পঞ্চাশের দশকে আবার বেশ কিছু ভালো পোস্টারের কাজ হয়েছিল — সত্যজিৎ রায়, খালেদ চৌধুরী, পূর্ণেন্দু পত্রী, ও.সি. গাঙ্গুলি, রণেন আয়ন দত্ত, রঘুনাথ গোস্বামী, মাখন দত্তগুপ্ত এবং আরও অনেকের হাতে। কিন্তু এদেরও বেশিরভাগই ছিল বিজ্ঞাপনধর্মী।

বর্তমান সমাজ প্রচারমুখী এবং এখানে বিজ্ঞাপনের ঝলমলানি নজর কাড়ে সবার। একজনকে বলতে শুনেছিলাম — ''দেখেছিস ওই হোর্ডিংগুলো? বাপরে শহরটা যেন শরশয্যায় শুয়ে আছে।'' মনে হয় শুধু এই শহরটাই নয়, গোটা দুনিয়া জোড়া শরশয্যা পাতা এদের বিংশ শতকের ক্ষয়িষ্ণু আত্মাটাকে নিরন্তর মৃত্যু আর অসুন্দরের কাছে পরাজয়ের গ্লানি টের পাইয়ে তিলে তিলে হত্যা করার জন্য। কিন্তু এই মৃত্যুর বিরুদ্ধে তো প্রতিবাদ করা যায়, কাটিয়ে ওঠা যায় পরাজয়ের গ্লানি, যদি শিল্পী তার স্থূল বাণিজ্যিক শক্তির হাতিয়ার 'পোস্টার'কে তারই বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে শুরু করে।

ইতিহাস আমাদের স্পার্টাকাসের গল্প বলেছে তাই জন্য আশা রাখি ক্রীতদাস পোস্টার আমাদের দেশেও নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ প্রাণবন্ত ''আর্ট পোস্টার'' হয়ে শিল্পের ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে যাবে নতুন পথে।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

প্রসঙ্গ ঃ পণপ্রথা

পুষ্পিতা বাগ
ছাত্রী, শিক্ষা বিভাগ

আজকের যুগে, সমাজে যুবশ্রেণির কাছে এক জ্বলন্ত সমস্যা হাজির হয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্য বিষয় আমরা সকলেই নীরব। এ নিয়ে কারোরই কোনো মাথাব্যথা নেই। আমরা যদি সকলে মিলে মিলিত প্রচেষ্টা নিই তাহলে কি আমরা পারি না এই দুর্নীতির হাত থেকে আমাদের বোনদের রক্ষা করতে? সমস্যাটা হল পণপ্রথা। সতীদাহ প্রথা রদ করার আগে সতীদাহ করা হত ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে, আর আজ সতীহত্যা করা হচ্ছে এক অকৃত্রিম লালসা থেকে। এই লালসা কোনোদিনই মিটবার নয়, যদি-না আমরা নিজেরা আত্ম-সচেতন হই। আমরা শিক্ষিত, সভ্য, আধুনিক ইত্যাদি নানা বিশেষণে নিজেদের ভূষিত করি। কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে বছরগুলোই শুধু এগিয়ে গেছে, আর আমরা যেখানকার সেখানেই দাঁড়িয়ে আছি। শুধু বহিরাবরণটা একটু চকচকে হয়েছে, ভালো পোশাক পরতে শিখেছি, ঝাঁকড়া চুল রাখতে শিখেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

দিনটা ঠিক মনে নেই। ব্যক্তিগত কাজে আমাকে প্রায়ই রানিগঞ্জ যেতে হয়। ট্রেনে যেতে যেতে দুজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়। কথার মাধ্যমে জানতে পারি কন্যার বিয়ের টাকা জোগাড় করার জন্য হন্যে হয়ে তাঁরা ঘুরছেন। সাধারণ একজন চাকুরিজীবী ছেলের Demand শুনে আঁতকে উঠি। কিন্তু এগুলো জোগাতে না পারলে তাঁর কন্যার বিবাহ যে কোনোদিনই হবে না এও তাঁর মুখ থেকে শুনতে পাই। ভদ্রলোক আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু কলকাতা থেকে সুদূর বর্ধমানে গিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কালের গতিতে ব্যাপারটা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। বেশ কিছুদিন পর যখন ওই পথে আবার যাচ্ছি তখন ভদ্রলোকের সেই বন্ধুটির সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে চিনতে পারেননি। আমি নিজে পরিচয় দিয়ে ভদ্রলোকের কন্যার বিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করাতে চশমার ভেতরে তাঁর চোখদুটো জলে ভরে যেতে দেখলাম। তাঁর মুখ থেকে যা জানতে পারলাম তার সারমর্ম এই যে—পণের নগদ পাঁচ হাজার টাকা জোগাড় করতে না-পারার জন্য বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর, বহু অপমান সহ্য করার পর যখন কোনোমতে বিয়ে হয়ে গেল তখন কন্যার পরিণতির কথা ভেবে তিনি নিজেই আত্মবিসর্জ্জন দিয়েছেন। ভদ্রলোকের বন্ধু এই সংবাদটুকুও আমাকে কিছুতেই বলতে চাইছিলেন না পাছে কোনো সংবাদপত্রে তাদের নাম উল্লেখ করে দিই। আমি শপথ করে বলেছিলাম এই কথা কোনোদিনই কারোর কাছে প্রকাশ করব না। কেন জানেন? আমাদের বোনটি নগদ পনের টাকা না-দিতে পারার জন্য ও একটি অঙ্কুরকে পৃথিবীতে নতুন আলো দেখানোর তাগিদে এই পৈশাচিক অত্যাচার দিনের পর দিন সহ্য করে চলত। পাছে সংবাদপত্রে বেরোলে অত্যাচার আরও বাড়ে, তার জন্য আমাকে শপথ করতে হয়েছিল। রেডিও খুললেই শুনতে পাই পণ দেওয়া ও পণ নেওয়া উভয়ই আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত একজনও কি এই দণ্ড পেয়েছেন? আমার জানা নেই। আপনাদের জানা থাকলে আমাকে অবশ্যই জানাবেন। নারী উন্নয়ন নিয়ে দেশে-বিদেশে আমরা নানাবিধ কর্মসূচি নিচ্ছি। কিন্তু আমরা একবারও বলছি না — আসুন আমরা এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

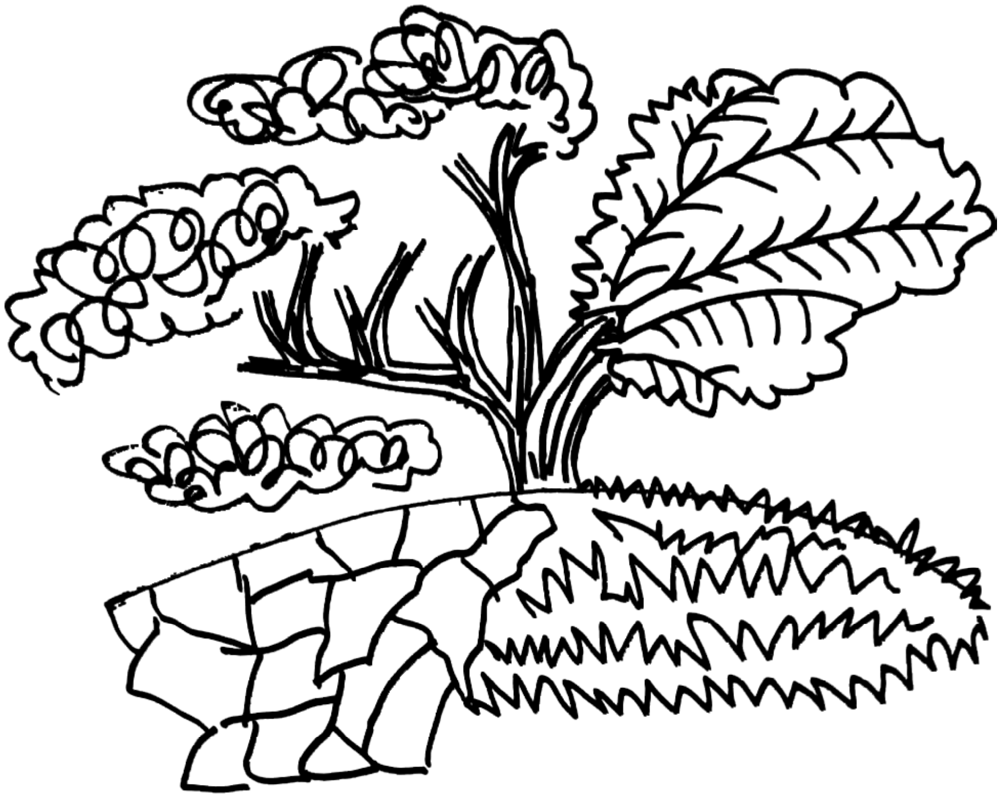

পরিবেশ দূষণ

ডোনা বৈদ্য

ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ইংল্যান্ডের কোনো এক শহরে একটি বালিকা তার স্কুলের খাতায় লিখেছিল — আকাশের দিকে তাকালে কালো ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু আমি দেখতে পাই না। গুরুজনদের মুখে শুনেছি যে তারা এক সময় আকাশের দিকে তাকালে কত পাখি উড়ে যেতে দেখত। গল্পের সেই পাখিদের আমি কোনো দিন-ই দেখতে পেলাম না। আধুনিক যুগ এ-কালের মানুষের কলকারখানার প্রতি নির্ভরশীল। কালো ধোঁয়ায় ভরা আকাশ তার কাছে সত্য ও বাস্তব, পাখি উড়ে যাওয়া গল্প কথা। ইংল্যান্ডের ওই বালিকাটির মতো মধ্য কলকাতার অন্ধ গলিতে জীবন কাটাচ্ছে এমন কেউ যদি তার স্কুলের রচনা খাতায় লেখে, আকাশ দেখা আমার হয় না। রাস্তা জুড়ে নোংরা ছাড়া আর কিছু দেখি না, ট্রাম, বাস প্রভৃতি যানবাহন এবং কলকারখানায় খটাখট শব্দ ছাড়া আর কিছু শুনি না — তবে আশাকরি তাকে আমরা দোষ দিতে পারব না।

সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় জানা যায় কলকাতা শহরে প্রতি বর্গমাইলে বাতাসে প্রায় ৬ টন ধুলো জমছে। এই ধরনের দূষিত গ্যাস বাতাসে জমতে থাকলে বিজ্ঞানীরা বিপদের গন্ধ পান। আমেরিকার বিভিন্ন বড়ো বড়ো শহরে এবং এদেশের দিল্লি, বোম্বাই প্রভৃতি শহরের তুলনায় কলকাতায় সেই ধরনের গ্যাস জমার পরিমাণ অনেক বেশি বলে দেখা গেছে। উল্লেখ্য, ভারত এবং অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে শতকরা ৪৪ ভাগ লোকের মৃত্যু হয় বায়ুবাহিত রোগে। তা ছাড়া শ্বাস কষ্ট, দৃষ্টিশক্তি হ্রাস, পঙ্গুত্ব প্রভৃতি তো আছেই। জন সংখ্যার বিস্ফোরণ, নগর পত্তন ও শিল্পোদ্যোগের প্রসার এই তিনের সম্মিলিত প্রভাবে জল, স্থল, বায়ুমণ্ডল সমস্তই আজ পলিউশনের শিকার। যে-হারে পরিবেশ দূষিত হয়ে চলেছে, তাতে অভিজ্ঞ মহলের সকলেই মানব সভ্যতার অস্তিত্ব বজায় থাকা সম্পর্কে সন্দিহান। পৃথিবীর সকল বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও রাষ্ট্রনায়কগণ আজ পলিউশনের সলিউশন সন্ধানে ব্যস্ত।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী পরিবেশে মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর বস্তুসমূহের আধিক্য বা অনুপ্রবেশই পলিউশন। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থায় পরিবেশে যে উপাদানগুলি বর্তমান, তাদের একটি বা দুটি কিংবা সবকটির পরিমাণ বা ঘনত্ব বৃদ্ধি অর্থাৎ পরিবেশে অনুপস্থিত নতুন কোনো পদার্থের পরিবেশ অন্তর্ভুক্তিই হচ্ছে ‘পলিউশন’ বা ‘দূষণ’।

এবার পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের দূষণ সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

বায়ু দূষণ ঃ— পৃথিবীর পরিবেশ বরাবরই অল্প-বিস্তর দূষিত ছিল এবং ওই দূষণ সহ্য করবার ক্ষমতা নিয়েই পৃথিবীতে মানুষ, উদ্ভিদ ও অন্যান্য প্রাণীর আবির্ভাব ঘটেছে। খাদ্য বা জল ছাড়া মানুষ বা অন্যান্য প্রাণী কয়েকদিন বা কয়েক ঘন্টা বাঁচতে পারে। অথচ বায়ু বা অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারবে না পাঁচ মিনিটও। প্রতিদিন আমরা পরিবেশ থেকে যা কিছু গ্রহণ করি তার মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি শতকরা ৪০ ভাগ। জীবন ধারণের জন্য অত্যন্ত অপরিহার্য এই বায়বীয় অক্সিজেন। যান্ত্রিক সভ্যতার দ্রুতগতির সাথে সাথে নানা কারণে দূষিত হচ্ছে এই বাতাস। এছাড়াও যানবাহন সমূহের অ্যাকজষ্ঠ পাইপ থেকে প্রচুর পরিমাণে নির্গত হয়, শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক সীসার কণা। যানবাহনের জ্বালানী ট্যাঙ্ক থেকে উদ্বায়ী পেট্রলও বায়ুকে দূষিত করছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে কার্বন ডাই-অক্সাইড ভূ-পৃষ্ঠ হইতে সূর্যরশ্মি পুনর্বিকিরণের সময় অবহেলীত বা ইনফ্রা-রেড রশ্মি শোষণ করে উষ্ণতার বৃদ্ধি ঘটায়। অতএব বায়ুতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে কেবল জীবজগতে শ্বসনে ব্যাঘাত ঘটাবে, তাহা নহে, ইহাতে মেরু প্রদেশের তুষার গলে সমুদ্রের জল পর্যন্ত পরিমাণ বৃদ্ধি করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটতে পারে। বাতাসের উর্দ্ধ স্তরে সামান্য পরিমাণে ওজন গ্যাস থাকা অত্যন্ত জরুরী কেননা ঐ গ্যাস সূর্য হতে বিচ্ছুরিত আলট্রাভায়োলেট রশ্মিকে পৃথিবীতে আসতে দেয় না। তার ফলে পৃথিবীতে জীবজগতের অস্তিত রক্ষা সম্ভব হয়।

বায়ু দূষণের ফলে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে চোখ, কান, নাক, গলা ও ফুসফুসের নানা জটিল ব্যাধিতে। দূষিত বায়ু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে গাছ পালা, জীবজন্তু সুরম্য অট্টালিকা সমূহ স্মৃতিসৌধ প্রভৃতি সমস্ত কিছু।

জল দূষণ ঃ— জলের অপর নাম জীবন। দৈনন্দিন জীবনে জল মানুষের তথা সমস্ত জীবজগতের একান্ত প্রয়োজনীয়। জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় এই জল নানা কারণেই দূষিত হচ্ছে। নদীর জল কলুষিত হওয়া পরীক্ষা প্রসঙ্গে একটি হচ্ছে গঙ্গা, দামোদর, গোমতি প্রভৃতি নদীর জল সংগ্রহ করে তাঁর অনুসন্ধান করছেন বাস্তবিকই নদীর আত্মসুদ্ধি ক্ষমতা আছে কিনা। প্রচলিত ধারণা নদীর জলে বহু পদার্থ ধরা পড়েছিল, অর্থাৎ নদীর

জল স্বাভাবিক আত্মসুদ্ধি ক্ষমতা হারিয়েছে। শহরাঞ্চলের সমস্ত ময়লা আবর্জনা এবং কারখানার বর্জ্য পদার্থ সমূহ নর্দমা ও খাল মারফত ফেলা হয় নদীর জলে। কারখানার বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থের জল দূষণ ক্ষমতা মারাত্মক। এই জল ব্যবহারের ফলে দেখা যায় নানা রকম আন্ত্রিক রোগ ও জটিল চর্মরোগ। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গেছে অনেক অনেক নদীর জলই এখন স্নানের পক্ষে নিরাপদ নয়। জল দূষণের ফলে জল ও প্রাণী বিশেষ করে মাছদের জীবনহানি ঘটছে প্রচুর পরিমাণে। বিগত পঞ্চাশ বছরে ১০০০ বিভিন্ন ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদের চির অবলুপ্তির একমাত্র কারণ এই জল দূষণ। আন্তর্জাতিক ব্যাবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রগামী জাহাজের চলাচল বৃদ্ধি পাওয়ায়, জলের উপর তেলের স্তর বিস্তৃততর হচ্ছে। এ ছাড়াও সমুদ্রে নানা রকম পারমানবিক বিস্ফোরণ ও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে সমুদ্রের জল দূষিত হচ্ছে।

পানীয় জলে অজৈব নাইট্রোজেন যৌগের পরিমাণ বেড়ে গেলে সেই জলের মাধ্যমে শিশুদের নাইট্রাইট বিষক্রিয়া এবং বয়স্কদের অন্ত্রে নাইট্রোস্যামিন জমার ফল স্বরূপ ক্যানসারের সম্ভাবনা। প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন সার ব্যবহারের ফলে দিল্লি ও পাঞ্জাবের অনেক টিউব-ওয়েল জলে নাইট্রেট-এর মাত্রা নিরাপদ সীমার অনেক উপরে থাকতে দেখা যাচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা নানা প্রকার রাসায়নিক সার ও কীটানুনাশক ঔষধ বৃষ্টির জলের মাধ্যমে পুকুর, খাল বিল, নদী প্রভৃতিতে মিশেছে এবং জলকে করছে কলুষিত। উদ্ভিদ মূলের সাহায্যে মাটি থেকে রস সংগ্রহের সময় দ্রবীভূত এই বিষ আহরণ করে তার ফলে শাক সবজি, ফল মূল এমনকি গো-দুগ্ধেও মিশে থাকছে এই সব রাসায়নিক বিষ।

এই সব তীব্র বিষ পান করে আমরা সকলে নীলকণ্ঠ হতে চাইছি বটে, কিন্তু এদের মৃদু ক্রিয়া তিলে তিলে ক্ষয় করছে আমাদের জীবনী শক্তিকে।

স্থল দূষণ ঃ— লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বসবাসের জন্য ব্যবহৃত জমির পরিমাণ যত বাড়ানো হচ্ছে চাষের জমির পরিমাণ তত কমছে। নগর পত্তন ও শিল্পে প্রসারে ধ্বংস হচ্ছে বন এবং বনজ সম্পদ। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, উদ্ভিদ সংখ্যা হ্রাস পেলে ভূমিক্ষয়ের হার বৃদ্ধি পায়। তা ছাড়া বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যায়। পরিকল্পনাহীন নগর পত্তন এবং অত্যধিক লোকের বসবাসের ফলে শহর ও শিল্পাঞ্চলের জমি পরিষ্কার রাখা সম্ভবপর হচ্ছে না। যার ফলে নানা জায়গায় দেখা যায় আবর্জনার স্তূপ — নগর জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে।

শব্দ দূষণ ঃ— বর্তমানে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশ দূষিত করণের উপাদান হল শব্দ। এর বিরুদ্ধে কয়েক দিন আগেই কলকাতার শিশুরা মিছিলে নেমেছিল। সাধারণভাবে উড়োজাহাজ, বিভিন্ন প্রকার যানবাহন, কলকারখানা, বেতার যন্ত্র, দূরদর্শন, লাউড স্পিকার, আতসবাজি প্রভৃতি হল শব্দের উৎপাদক। এই সকল শব্দ কেবলমাত্র মানব জীবনের ব্যাঘাত ঘটায় না, তা বহুলাংশে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের ক্ষতিসাধন করে; যেমন স্নায়ু উৎপীড়ন, বদহজম, অম্ল, হৃদরোগ বধিরত্ব ইত্যাদি।

সজীব পরিবেশ দূষণ ঃ— মানুষ নির্বিশেষে প্রকৃতির সম্পদ ধ্বংস করে চলেছে। এর ফলে প্রকৃতির ভারসাম্য বিঘ্নিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত পর্যাপ্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধিও সজীব পরিবেশ দূষণের অপর একটি মুখ্য কারণ। মানষ যথেষ্ট বনজ সম্পদ ও বন্যপ্রাণী নিধন করে খাদ্য শৃংখলের ভারসাম্য সূত্র ছিন্ন করে তার নিজের ব্যবহারের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যে হারে নিঃশেষ করছে তাতে তার জীবন ধারণ অচিরেই সঙ্কটাপন্ন হতে চলেছে। পরিবেশ দূষণ আজকে শুধু নির্দিষ্ট কোনও দেশের সমস্যা নয়। সমগ্র পৃথিবীর মানুষ, জীবজন্তু গাছপালার ভবিষৎ অস্তিত্ব আজ নির্ভর করছে এই সমস্যাটির আশু সমাধানের উপর। পৃথিবীবাসী হিসাবে প্রতিটি মানুষের

এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার দিন এসেছে আজ। কাজেই পলিউশনের ভয়াবহতার কথা আপাততঃ রেখে সংক্ষেপে তার প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু ভাবনা চিন্তা করা যাক ঃ—

১) কলকারখানাগুলির বিকেন্দ্রীকরণ।

২) শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর আধুনিকীকরণ। গ্রামাঞ্চলের মজা খালবিলসমূহের সংস্কার সাধন।

৩) কারখানার নির্গত ক্ষতিকারক পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত রাসায়নিক পদ্ধতি উদ্ভাবন এবং বর্জ্য রাসায়নিক পদার্থ সমূহ জলে না ফেলা।

৪) উপযুক্ত অণুজীব এবং এনজাইমের সাহায্যে জৈব আবর্জনাকে কম্পোষ্ঠ সারে পরিণত করে কৃষিকাজে লাগান।

৫) পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃক্ষরোপণ। বিনা কারণে বনজ সম্পদ নষ্ট নিষিদ্ধকরণ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ।

৬) পারমাণবিক অস্ত্রের ব্যবহার সীমিতকরণ।

৭) লাউড-স্পিকার নিম্নগ্রামে বাজানো এবং প্রভৃতির সাহায্যে শব্দ দূষণ নিষিদ্ধকরণ।

* * *

প্রবন্ধ-নিবন্ধ

পৃথিবী ও জীবের সৃষ্টি

দীপঙ্কর পাল
ছাত্র, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

আজ-কাল আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে আমাদের এই বিশাল পৃথিবী কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে? অনেক সাধুদের বিশ্বাস যে এ বিশাল পৃথিবী, সর্বশক্তিমান ভগবান কোনো বিশেষ কারণে পৃথিবী ও জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন — এ ধারণা পুরাকালে প্রায় সকলের। আদম ও ইভ, আর তাদের জ্ঞান বৃক্ষের ফল খাওয়া আজও আমাদের মনকে ক্ষণিকের জন্য অন্য জগতে নিয়ে যায়।

আজ হতে প্রায় ৩৫০ কোটি বৎসর পূর্বে সূর্যের থেকে আকারে বহু গুণ বড়ো এ-রূপ নক্ষত্ররাজী কোনো এক কারণে সূর্যের কাছ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যায়, সূর্য হতে একটি অগ্নিপিণ্ড ছুটে সূর্যের চারপাশে ঘুরতে থাকে। কারণ নক্ষত্ররাজীর আকর্ষণশক্তি এত বেশি যার ফলে সূর্য হতে অগ্নিপিণ্ড ছুটে যায় এবং নক্ষত্ররাজীর আকর্ষণে আকক্ষিত হতে পারেনি যার ফলে সূর্যের আকর্ষণ শক্তি ঐ অগ্নিপিণ্ডের আকর্ষণ শক্তির চেয়ে বেশী বলে সূর্যের চার পাশে ঘুরতে থাকে। কিন্তু এ অগ্নিপিণ্ড ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে বায়ুবাঁয় তার পর তরল এবং কঠিনে ধারণ সন্ধিক্ষণে অর্ধ স্বচ্ছ যার নাম পৃথিবী। পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ স্থল, বাকী তিন অংশ জল।

অনেকের ধারণা আজ হতে প্রায় দু-হাজার মিলিয়ন বৎসর পূর্বে পৃথিবীর তরল এবং কঠিন আকার ধারণের সন্ধিক্ষণে অর্ধ স্বচ্ছ, জেলির মত দানা-দানা এক প্রকার সজীব পদার্থ ভাসিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। বৈজ্ঞানিক Huxby-র মতে এগুলি 'প্রাণের বস্তুগত ভিতি' অর্থাৎ 'প্রোটোপ্লাজম' এপ্রোটো প্লাজম হতে ধীরে ধীরে বিবর্তনের ফলে সৃষ্টি হল উদ্ভিদ-প্রাণী-মানুষ।

কালক্রমে এককোষী জীব হতে সৃষ্টি হল দুটি দল উদ্ভিদ ও প্রাণী। বৈজ্ঞানিকগণ মনে করেন, প্রায় ৩০ কোটি বৎসর পূর্বে উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। প্রথমে শৈবাল, তার পর ছত্রাক, মস ও ফনিবর্গ। তার পর ব্যক্তবীজী এবং এ হতে আবির্ভাব হয়। গুপ্তবীজী বা পুষ্পক উদ্ভিদ।

অন্যদিকে প্রথমে অনেকদণ্ডী ও পরে মেরুদণ্ডী প্রাণীর আবির্ভাব হয়। প্রায় ৫০ কোটি বৎসর পূর্বে মাছের সৃষ্টি এবং এর মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে প্রথম। তার পর আসল উভয়চর প্রাণী। অনুমান ১৮ কোটি বৎসর পূর্বে সরীসৃপ ও ১৪ কোটি বৎসর পূর্বে পাখির আবির্ভাব হয়। সবশেযে স্তন্যপায়ী এবং ৩ লক্ষ্য বৎসর পূর্বে মানুষের সৃষ্টি।

সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত দার্শনিক এবং পণ্ডিতগণের অন্ধ বিশ্বাস ছিল, কোন পঁচা জিনিসের, কাদা বা মিঠা জল হতে জীবের উৎপত্তি হয়। কিন্তু গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল (Aristole) খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন এ সম্ভবযোগ্য!

তারপর ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে ইতালির বৈজ্ঞানিক রেডি বলিলেন, পঁচা মাংসের গায়ের মাছির ডিম হতে মাছির জন্ম। বিখ্যাত ফরাসি বৈজ্ঞানিক লুই পাস্তুর প্রমাণ করলেন পঁচা জিনিস হতে কীট-পতঙ্গ জন্মে না।

অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা অন্য গ্রহ হতে জীবের সৃষ্টি অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণির জীব উলকাপিণ্ডের সঙ্গে পৃথিবীতে আসে।

কার্বন নাইট্রোজেন মিলিত হয়ে সায়োনো যৌগিক পদার্থ হতে প্রোটোপ্লাজমের সৃষ্টি বলে অনেক বৈজ্ঞানিকের ধারণা। তবে এ ধারণার জনক বৈজ্ঞানিক ফ্লুজার।

ESSAY

An essay based on a research on 'Violation of Women'

Paramita Halder
Department of English

Half the sky, thou are women once said Mao-Tse-Tung. No society can advance without proper recognition of womens' existence. But the hard hitting truth is that, women are subject to all kinds of violation and discrimination all over the world. The consequence would surely be paid by the entire society as neglecting the needs of women, one invites the downfall of the very structure of a society.

Be it a daily labourer, or an executive working in a corporate house, everybody lives under the threat of being either physically or mentally violated. Amnesty, the world's leading human rights organisation has projected a bleak scenario pinpointing that at least one in three women in the world is likely to suffer "Serious violence" in their life time.

"Violence against women is a cancer eating away at the core of every society, in every country of the world." said Ms. Irene Khan, Amnesty Internationals secretary general listing different ways of atrocities being unleashed on women globally. Millions of women are beaten, raped, murdered, assaulted, denied the right to ever exist, and multilated with impunity.

The plight of women is the same at every strata of society. Manjuara, a lady coming from Ghutiarisharif, South 24 Parganas, to work as maid in the South Calcutta suburb, stays with her aging parents and brothers after being abandoned by her husband at the age of seventeen. Manju, the sole earner of family, till last monsoon had a mud-walled hut she could call her own but has been compelled to give it up to her younger brother when the latter got married and now sleeps on the veranda. Her brother has the full support of her parents as he is a male member and has 'a right to the family property' though he lives on Manju's wage. Swati Roy a teacher at a Govt. High School, prays for a grandson and held a Puja at her home for a male member when her daughter Piya conceived. A self proclaimed progressive minded lady and a member of a prestigious social welfare organisation, feels it is more difficult to bring up a girl and a boy can be encouraged to study as much as he wants to, but a girl has to be married off at a certain 'ideal' age. In Krishnanagar on March 19th 2004, a father reluctant to bear with the 'pain' of having a daughter, poisoned the forty day old baby to death. Mr. Sanat Mondal, the father comes from an affluent peasant family. Joya's parents responded to an advertisement in a news paper last year that said "Wanted : bride for smart, non-resident Indian (U.S. Based) groom% H-1-B visa holder, six-figure income". In November last year, Joya was married with great fanfare to Tapan, her parents the envy of neighbours and friends for having landed such a prize "catch". The newly married left for their new home on the outskirts of Boston in early December. At the end of February, volunteers from the Boston-based crisis managements centre "Saheli" smuggled Joya out of her husband's home. She had been traumatised, not given money to call her folks at home, starved and consistently brutalised over the two-month period.

The statistics of violence against women reveal a world wide human rights catastrophe. In the USA, women accounted for 85 percent of the victims of domestic violence in 1999. The Council of Europe has stated that domestic violence is the major cause of death and disability for women aged 16 to 44. According to the latest FBI statistics, every 9 seconds a woman is abused in America. Nearer home, in the South Asian Communities, an estimated one in every four families experiences some kind of abuse. Sakhi, a domestic violence crisis centre dedicated to South Asian women, receives approximately 30 new cases every month. From birth to death, in times of peace as well as war, women face discrimination and violence at the hands of the state, the community and the family. Millions of girls and women are routinely subjected to female infanticide, rape and physical abuse, forced pregnancies and abortions, bride burning, dowry related abuses and other gender based crimes. According to an estimate by Prof. Amartya Sen, over 60 million women are 'missing' from the world to-day as a result of sex-selective abortions and female infanticide. The WHO has reported that upto 70 per cent of female murder victims are killed by their male partners.

Underlying cause of violence against women lies in the discrimination which denies women equality with men in all areas of life. The school enrolment ratio for women is only 46 (male = 100). In India, women earn only 19% of the national income because 90% of them work in the unorganised sector for low pay or no-pay jobs. Women workers are by and large an undervalued lot. In the agricultural sector women's work goes unpaid and home based workers are not covered under labour laws or the Factory Acts.

The consequence would be paid by the entire nation if this continuous outrage against women is not curbed. Women play pivotal roles in the development of family, society and the entire nation. Though Govt. is aware of the fact and legislations exist to curb such violence, the authorities routinely fail to implement it and in many cases community and religious leaders actually allow it to exist. Formulating a national policy alone would not improve the situation, an over-all change in attitude is necessary for improving the bleak social scenario and for building a better future and a better nation as a whole.

(Based on a Personal Survey and information collected from the Print Media)

ESSAY

HOPE

Sk. Sahil Rahaman

Student, Department of Commerce

Hope is a word which we have used umteen time, but unfortunately many of us don't even know the meaning of the word and don't realize it's importance.

What is Anticipation ? What is Hope ?

"Hope may be defined as a combination of desire and expectation". Everybody hopes for something or the other, sometime or other conventially, we hope something without expecting to get it. For instance we may desire high marks in the examination but we really don't expect it. On the other hand, we may expect something to happen though we may not desire it. But, it is only when we expect to get what we desire that we hope.

For Human being hope is natural. It has a lot of power behind it, ondities very difficult to kill it. There is on ancient saying that, we live by hope' and this is very much true. It is hope that really beeps us alive. The moment a man loses hope as falls into despair, he finds it pretty difficult to cope with life.

Life becomes a burden (load) to him. He meets with failure in whatever he does.

Hope provides us with a spirit to fright against despair, difficulties & failure. For example, when we are ill, we feel the pain for we hope to get relien patiently we endure trouble and suffering without complaining. We bear misfortunes because we hope these is a better time coming. We endure infastise for we hope that a day will come when there will be justice.

But it is essential for our hopes to be tolerable and reasonable as they will lead us into disappointment and misery.

Most of its hopes to become millionaiere scholars as author even though we may not have any such qualities at all in us. It is rather silly to think such things. If we hope for some thing which is impossible, we are only inviting disaster & feulure.

"OPTIMISM IS ALWAYS BETTER THAN PESSIMISM"

Therefore, we should always beep in mind that hope is a great 'power' that guide us from the miseries, difficulties & failures lost hope is just lipe a lost battle, All though we fail to achieve something, we must never give up hope; for :-

"EVERY PARK NIGHT IS FOLLOWED BY A BRIGHT MORNING".

THOUGHTS

Balance Sheet of Life

Ram Ratan Singha
Department of Mathematics

Our birth is our Opening balance.
Our death is our Closing balance.
Our prejudices are our Liabilities.
Our Creative ideas are our Assets.
Heart is our Current Asset.
Soul is our Fixed Asset.
Brain is our Fixed Deposit.
Thinking is our Current Account.
Achievement are our Capital.
Friends are our Goodwill.
Patience is our Dividend.
Children is our Bonus issues.
Education is our Patents.
Knowledge is our Investment.

The aim of our life is to tally.
The balance sheet accurately.

THOUGHTS

REASON BEHIND FAILING

Ankita Das
Department of Physics

There are 365 days in a year. Each week one sunday, the relaxing day. So no studies on sunday.
: day left = 365 – 52 = 313 days.

Summer Vacation = 1 month gone
: days left = 313 – 30 = 283 days.
Winter Vacation = 10 days gone
: days left = 283 – 10 = 273 days.
2 hrs. of play per day, which is good for health, means 30 days gone.
: days left = 243 – 122 = 121 days.

2 hrs. every day gone in eating, so 30 days gone.
: days left = 121 – 30 = 91 days.

Festival holidays i.e. Puja & Diwali, so 15 days gone.
: days left = 91 – 15 = 76 days.

1 hr. per day gone in brushing, bathing, clothing and setting routine, so 15 days gone.
: days left = 76 – 15 = 61 days.

15 days gone as sickness leave
: days left = 61 – 15 = 46 days.

2 hrs. of talking per day (after all, all students are social animals). So, 30 days gone.
: days left = 46 – 30 = 16 days.

7 days a year gone in reading newspaper
: days left = 16 – 7 = 9 days.

1/2 hrs. a day gone for entertainment and watching movies, i.e. 7 days gone.
: days left = 9 – 7 = 2 days.

Among 2 day's 1 day is your birthday.
: days left = 2 – 1 = 1 day.

Now I request the teacher to think over & say can we prepare successfully and pass in a single day. So if we fail it is not our fault because this typical academic year looks like this.

ও গল্পের পাতা

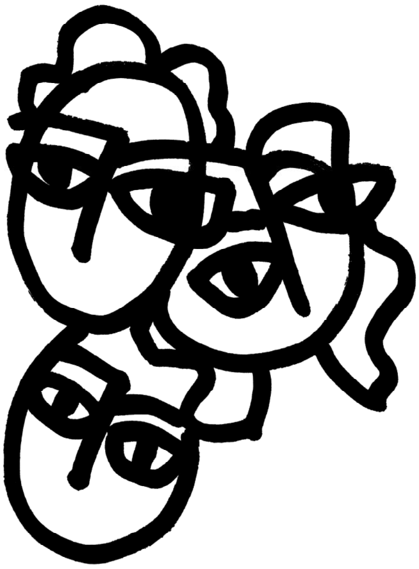

গল্পের পাতা

স্বপ্ন হলেও সত্যি

সৌম্যদীপ ঘোষ

ছাত্র, বাংলা বিভাগ

একদিন আমরা সবাই বিছানার উপর বসে গল্প করছি। আমরা বলতে আমি (রাজু) ও আমার দুই ভাগনে ও ভাগনি চৈতালী ও সুমন, এবং ছোট ভাইপো রাজীব। তখন শ্রাবণ মাস। ঘন বৃষ্টি ও বিদ্যুৎ চমকানীতে আমার ভাইপো আমাকে অস্থির করে তুলেছে। হঠাৎ চৈতালী বলল — মামা একটা গল্প বল যা একদম সত্য। অমনি ভাইপোর তো আর কথা নেই, যেহেতু কাকার গল্প তার খুব ভাললাগে। তাই সবাই মিলে ধরল যে গল্প তোমায় বলতে হবে, তাও আবার ভূতের। আমি প্রথমে বললাম যে ভয় পেলে আমি জানি না কিন্তু, সবাই বলে না না কেউ ভয় পাবে না।

ঠিক আছে, যদি তোমরা কেউ ভয় না পাও তবে খুব ভালো কথা। এবার শোনো বলি —

আমরা যখন চাকদাহে থাকতাম, তখন ওখানের একটি মেয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মেয়েটির নাম ছিল মাম্পি। মাম্পি তখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ত, আর আমি তখন অষ্টম শ্রেণিতে পড়ি। মাম্পির সাথে আমার খুব ভাব ছিল। এত ভাব যে দুই জন দু-জনকে না-দেখতে পেলে আমাদের রাতে ঘুম হত না। তার জন্য আমি একদিন মাম্পিকে বললাম যে তুমি কাল থেকে আমাদের বাড়িতে পড়তে আসবে। মাম্পি এই কথা শুনেই রাজি হয়ে গেল। মাম্পি বলে যে — রাজুদা আমি একথা তোমাকে অনেক আগে বলব বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু তুমি যখন বলে দিলে 'ত' — তারপর থেকে আমাদের মধ্যে এমনভাবে দিন চলে যায় যে কিছুই বুঝতে পারতাম না। যতদিন যায়, তত ভালোবাসা গভীর হয়ে ওঠে।

— আমার মা কী বাবা কিছুই বলতেন না।

যার ফলে উদার আকাশের তলে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতাম।

একদিন বাবা এসে মাকে ডেকে কী যেন বললেন, তা জানলাম না, কিন্তু মা শুনে কেমন যেন হয়ে গেল। তারপর দিন আমাকে যা বললেন তা বলার মতো নয়। আমি মনের দুঃখে চুপি চুপি মাম্পিকে বললাম, প্রথমে মাম্পি শুনে বলল যে — কী হয়েছে রাজুদা, তোমার বাবা বদলি হয়ে যাচ্ছে এতে তোমার রাগের কী আসে যায়। — আমি বললাম যে মাম্পি বাবার সঙ্গে আমাদেরও যে যেতে হবে। অমনি মাম্পি কেঁদে দিল। বলে — রাজুদা তুমি যদি চলে যাবে, তবে আমাকে কে দেখবে।

— কেন?

— তুমি চলে গেলে আমি থাকতে পারব না, তুমি যেও না রাজুদা, যেওনা।

— মাম্পি, কেঁদে কী হবে, আর মন খারাপ করলে তো বাবার বদলির অর্ডার তো আর বাতিল হবে না।

— রাজুদা তুমি ওইখানে গিয়ে চিঠি দেবে তো।

— হ্যাঁ দেব।

— দেখিস তুই, আমি ঐখানে গিয়ে প্রথমে তোকে চিঠি দেব।

আমি পৌঁছে প্রথমে কয়েকটা চিঠি দিলাম। তারপর মাম্পিও চিঠি দিল, তা পড়ে জানতে পারলাম যে মাম্পির জ্বর হয়েছে। জ্বরের পর মাম্পির আর কোনো চিঠি পেলাম না। যে-মাম্পি আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না, সেই মাম্পি কিনা চিঠি দেওয়া বন্ধ করে দিল। অনেক ভেবে ভেবে একদিন বেড়িয়ে পড়লাম মাম্পিদের বাড়ির উদ্দেশে, চাকদহ নেমে হেঁটে চলেছি, পথে হঠাৎ মাম্পির সঙ্গে দেখা হল। পথে চলতে চলতে অনেক কথা বলল, তাতে কিছু বুঝলাম না। — তুমি এতদিন এলে না কেন রাজুদা?

— তুমি এতদিন চিঠি দাওনি কেন?

— চলতে চলতে ওদের বাড়ি এসে গেল। আমি পাশে তাকিয়ে দেখি যে মাম্পি নেই। পিছনে তাকালাম। ওখানে দাঁড়িয়ে যে, মাম্পি কী হল, বাড়ি যাবে না, ওখানে দাঁড়িয়ে কেন?

— তুমি যাও আমি একটু পরে যাব।

— কেন? আমি এতদিন পরে এলাম, আর তুমি এখন বন্ধুর বাড়ি যাবে। না বন্ধুর ওখানে যাব না, আমি দোকানে যাচ্ছি।

— তাড়াতাড়ি এসো।

— হ্যাঁ আসব।

আমি যখন ওদের বাড়ি ঢুকলাম এবং যা দেখলাম তা অবর্ণনীয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমি ঢুকেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কী ব্যাপার কিছুই বুঝতে পারছি না, ওর মা কেঁদে উঠল, মাসিমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন যে ...

— কী করতে এসেছ রাজু, আর কিছুদিন আগে আসতে পারলে না, সব যে শেষ হয়ে গেছে, মাম্পি তোমাকে আমাকে ও সবাইকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে গেছে।

— আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না। যখন বলল যে ও চিরকালের জন্য বুকের খাঁচা ভেঙে চলে গেছে, তখন আমি বুঝতে পারলাম। আমার চোখ তখন জল ভরে গেছে। শুধু কাঁদতে পারছি না, কারণ আমি কাঁদি কী করে? আমার যে বুক ফেটে যাচ্ছে। আমি চুপ করে ভাবতে লাগলাম এ কী করে হয়, এ তো হতে পারে না, তবে এমন হল কেন? আমি তখন ওর বাবার কাছে বসে সব শুনতে চাইলাম। তখন যা বলল তা শুনে আমার চোখের জল আর স্থির থাকতে পারেনি, বলল যে

— তোমরা চলে যাবার পর ওর শরীর খারাপ করল। ডাক্তার এলো, ঔষধ দিল, কিছুই হল না।

— আমি বললাম যে চিঠিতে তো উল্লেখ ছিল না।

— ওটা লিখতে বারণ করে ছিল মাম্পি, কারণ পাছে তুমি ছুটে আস, তার জন্য তোমায় ও জানাতে বারণ করে ছিল।

ওর বাবা চোখের জল মোছে আর বলে, তারপর একদিন খুব জ্বর হল, একদম জ্ঞান হারা হয়েছিল। আর যখন জ্ঞান ফেরে তখন শুধু তোমার নাম করে, রাজু আর রাজু, রাজু কই? এইভাবে কয়েকদিন যাবার পর, একদিন আমাদের সবাইকে ছেড়ে, তার নিজের রাজুকে ছেড়ে চলে গেল।

— রাজু, তুমি বড্ড দেরি করলে রাজু —

আমি মনে মনে একবার মাম্পির উদ্দ্যেশে ভগবানের কাছে তার আত্মার শান্তি কামনা করলাম।

— এমন সময় চৈতালী বলে উঠল মামা তুমি মাম্পিকে খুব ভালোবাসতে।

— কে বলল তোকে?

— না তোমার চোখে জল!

হঠাৎ ভিতর থেকে ডাক এলো সবাই চলে এসো।

গল্পের পাতা

স্বপ্নের ঘোরে

রানা পাল
ছাত্র, শিক্ষা বিভাগ

আমি যেন ১৯৮৫ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীর সঙ্গে বহুদিন ধরে কাজ করেছি। বিজ্ঞানীদের যে কত রকমের শ্রম হয় তা প্রত্যক্ষ করছি আর অবাক হয়ে যাচ্ছি। দিন নেই রাত নেই শুধু Experiment আর Experiment করে করে হাঁপিয়ে উঠেছি। ঠিক কী যে তিনি করতে চাচ্ছেন, কী যে খুঁজছেন কিছুই বুঝতে পারছি না। এই গোলোকধাঁধাঁ থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। যখন এই সমস্ত চিন্তা করে চলেছি, ঠিক তখনই বিজ্ঞানী চার হাতপায়ে লাফাতে লাফাতে এসে আমাকে একেবারে পাঁজাকোলে করে উপরে ছুড়ে দিলেন। আমি তো একেবারে অবাক। এত রাত্রে এ আবার কোন্ উৎপাত শুরু করলেন। তিনি প্রায় চেঁচিয়ে বললেন পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি! — কিন্তু কী পেয়েছেন? কখন পেলেন? কিছুই বুঝলাম না। অবশেষে তিনি বললেন "তুমি আমার সঙ্গে ২০০০ বছর বেঁচে থাকতে পারবে"? আমি কিন্তু এবার তাঁর উপর বহুৎ চটে গেলাম। বললুম আগে সব কিছু খুলে বলুন তো দেখি! উনি বললেন ওঃ! তাই তো, তোমায় কিছুই বলা হয়নি তো, না? বললেন আমি আর তুমি ২০০০ বছর ধরে বেঁচে থাকব। তারপর প্রাকৃতিক দুর্যোগে সমস্ত পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা কিন্তু মরকোনা বিশেষ উপায়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকব। তারপর দেখব নতুন পৃথিবীর কার্যকলাপ।

আমি তো অবাক। এ আবার হয় নাকি? মানুষ বেঁচে থাকবে ঘুমিয়ে। তাও আবার ২০০০ বছর। বিজ্ঞানী বললেন 'পারবে তো'? বললাম হ্যাঁ পারব। কিছুটা ভয়, কিছুটা সংশয়, কিছুটা রসিকতা প্রকাশ পেল আমার গলার অদ্ভুত স্বরে। সেই মুহূর্তে কেন জানি না জেদ চাপল দেখাই যাক না বিজ্ঞানীর দৌড় কত দূর। বড়ো জোর আমরা ঘুমের ওষুধ-টসুধ খেয়ে সাত দিন ঘুমিয়ে আবার জেগে যাব। আবার সেই পুরোনো পৃথিবীকেই দেখব। তাই বললাম কেন পারব না? বেশ পারব। বিজ্ঞানী তো মহা খুশি, বললেন এই তো চাই। একজন অন্তত সঙ্গীর প্রয়োজন।

যেমনি বলা তেমনি কাজ। একটা শুভ দিন দেখে সব আত্মীয়স্বজনদের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে তৈরি হয়ে নিলাম। বেশ করে স্নান-আহার করা হল। সঙ্গে নিলাম প্রিয় সাদা গোলাপ। তারপর প্রবেশ করলাম বিজ্ঞানীর নিজের হাতে তৈরি মাটির নীচের সেই বিশেষ ঘরটিতে। ভেতরে ঢুকেই চমকে উঠলাম — শুধু যন্ত্রপাতি আর যন্ত্রপাতি। এক একটা বড়ো বড়ো দানব যেন নিজেদের মধ্যে হাসি ঠাট্টা করছে। বিজ্ঞানী বিভিন্ন বোতল দেখিয়ে বলতে লাগলেল এটাতে তারিখের হিসাব রাখবে, ওটাতে বাহিরের পৃথিবীর খবরাখবর নেবে, ওটাতে আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে, ওটাতে আমাদের পুনর্বার জাগিয়ে তুলবে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বললাম যদি যন্ত্রপাতি বিকল হয়ে যায়? উনি বললেন তেমনি কোনো সম্ভাবনা নেই। আমাদের যন্ত্রপাতিতে যতদিন সূর্যের আলোক থাকবে এবং পৃথিবীর চৌম্বক শক্তি থাকবে ততদিন ঠিক ঠিক কাজ করে যাবে। ভয়ে ভয়ে একবার বাহিরে যাবার অনুমতি চাইলাম। বললাম আমার কুকুরটাকে একবার দেখে আসি। উনি বললেন ওকেও নিয়ে আসতে। আমি তো আনন্দে বাইরে গেলাম এবং দশ মিনিট পরেই আবার ফিরে এলাম ওকে সঙ্গে নিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটা জানালা খুলে এক ঝলক সূর্যের আলোক ঘরের ভেতর আনলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত যন্ত্রপাতি কাজ করতে শুরু করল। সমস্ত বোতামগুলো টিপতে লাগলেন। আমাকে বিছানায় শুতে বললেন। তারপর উনিও শুলেন আমার পাশের বিছানায়। তারপর হাত বাড়িয়ে আর একটি বোতাম স্পর্শ করে বললেন আবার ২০০০ বছর পরে দেখা হবে; গুড বাই। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম ‘বাই’। তারপর একবার আমার দিকে তাকিয়ে সেই বোতাম টিপে দিলেন। তারপর আর কিছুই মনে পড়ে না। সব যেন মিলিয়ে গেল, শত সহস্র স্বপ্ন যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। সবই অস্পষ্ট, ঝাপসা।

হঠাৎ চমকে উঠলাম। কে যেন মস্ত এক ঝাঁকুনি দিয়ে আমাকে জাগিয়ে তুলল। তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। অস্পষ্ট দেখলাম যন্ত্রপাতি, আলো জ্বলছে। পাশে ফিরতেই দেখলাম বিজ্ঞানী আমার পাশে শুয়ে আছে। দুটো চোখ মেলা। ধীরে ধীরে সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেল। পাশেই কুকুরটা নড়েচড়ে উঠল। মনে পড়ল সেই Experiment-এর কথা। বিজ্ঞানী উঠে বসলেন। বললেন এস আমার সঙ্গে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম এখন সকাল না বিকেল? কী যেন একটা বোর্ড দেখে বললেন সবেমাত্র ভোর হয়েছে। বললেন আমরা ঠিক ২০০০ বছর পিছনে ফেলে এসেছি। আমাদের যন্ত্র ঠিক ঠিক কাজ করছে। গুড মর্নিং। আমি একই কথার পুনরাবৃত্তি করে বললাম ‘গুড মর্নিং’ আমি কিন্তু তার কথা কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না। ভাবলাম বড়োজোর একটানা তিন-চার দিন ঘুমিয়েছি। তবুও কেন যেন ভয় ভয় করছে। কেবলই মনে পড়ছে ভাই, বোন, আত্মীয়স্বজনদের কথা। যদি সত্যিই ওদের কাউকেই বাইরে না দেখতে পাই? দারুণ ভয় আর উত্তেজনা বোধ করছি। ওঁর পিছন পিছন এগোচ্ছি। নিজের পায়ের উপর যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছি!

দরজা খুলবার জন্য বোতাম টিপলেন। ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। অমনি এক ঝলক হিমেল বাতাস ঘরে ঢুকে পড়ল। আমাদের কুকুরটা এক দৌড়ে বাইরে চলে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার ঘরে দৌড়ে চলে এল। আমরা ভয় পেলাম; বিজ্ঞানী বললেন এসো, আমার পিছনে এসো।

পৃথিবীর মাটিতে পা ফেলতে ফেলতেই একেবারে চমকে উঠলাম। এ কী দেখছি! বন জঙ্গল আর জল। আকাশ রক্তগর্ভ — কে যেন সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। সামনেই একটা বিরাট গর্ত। ভেতর থেকে সাদা সাদা ধোঁয়া বেরুচ্ছে, তার চারিদিকে কারা যেন ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। চিৎকার করে উঠলাম ওরা কারা? এখন বুঝলাম

কুকুরটা কেন ভয় পেয়েছিল। বিজ্ঞানী বললেন ওরা সব এযুগের মানুষ। বুঝলাম ওঁর কথাই ঠিক। আমরা সত্যই ২০০০ বছর এগিয়ে এসেছি। ভিতরটা একেবারে ধড়াম করে উঠল। ওরা কী রকম মানুষ? লম্বা এক থেকে দেড় ফুট, সে কী ঠোঁট নেই কেন? কী বিশ্রি, কদাকার চেহারা! কান কোথায়? কানও তো নেই। লেজ কেন? মানুষের কি লেজ থাকে? আমি কী যে করব কিছুই ভাবতে পারলাম না। পাগলপ্রায় হয়ে খুঁজতে লাগলাম আমাদের সেই পুরোনো লাইব্রেরিটা। কিন্তু কোথায় কী? পিছন ফিরতেই দেখি মানুষের না কার যেন শত শত কঙ্কাল আর মাথার খুলির ভগ্নাবশেষ। বহু দূরে একটা লোমশ প্রাণী দেখা গেল। অনেকটা মানুষের মতোই। সারা শরীর সাদা লোমে আবৃত, চোখ দুটো যেন রক্তের ঢেলা। আমাদেরকে দেখে হাত নেড়ে ডাকলেন। এগিয়ে গেলাম তার দিকে, আকারে ইঙ্গিতে কী যেন সব বললেন। তারপর তার পেছনে এক গুহার কাছে হাজির হলাম। সেই অদ্ভুত দর্শন প্রাণীটা দুই হাত দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করতে করতেই একদল অনুরূপ প্রাণী সব বেরিয়ে পড়ল গুহার ভেতর থেকে। তারা সবাই আমাদেরকে নিয়ে ভালো একটা পাথরের চাঁই-এর উপর বসাল। তারপর বন থেকে ফুল, পাতা আর কত কী এনে আমাদের পায়ে মাথায় উজাড় করে দিতে লাগল। একজন একটা কী অদ্ভুত পাতা দিয়ে আমাদের বাতাস করতে লাগল। আমরা এতক্ষণে একটু আলোর সন্ধান পেলাম। আমি ভাবলাম যাক্ বাঁচা গেল। আমাদেরকে না জানি ওরা কী একটা ভাবছে। সকলেই বেশ আনন্দিত মনে হল। ওদের চোখগুলো যেন বিদ্যুৎতাড়িত। আমরা ক্যামেরা দিয়ে ওদের ফটো তুলতে লাগলাম।

হঠাৎ কে যেন গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে বলল বেলা হল, এবার ওঠ। চোখ মেলে দেখি মা আমার পাশে বসে আছেন।

গল্পের পাতা

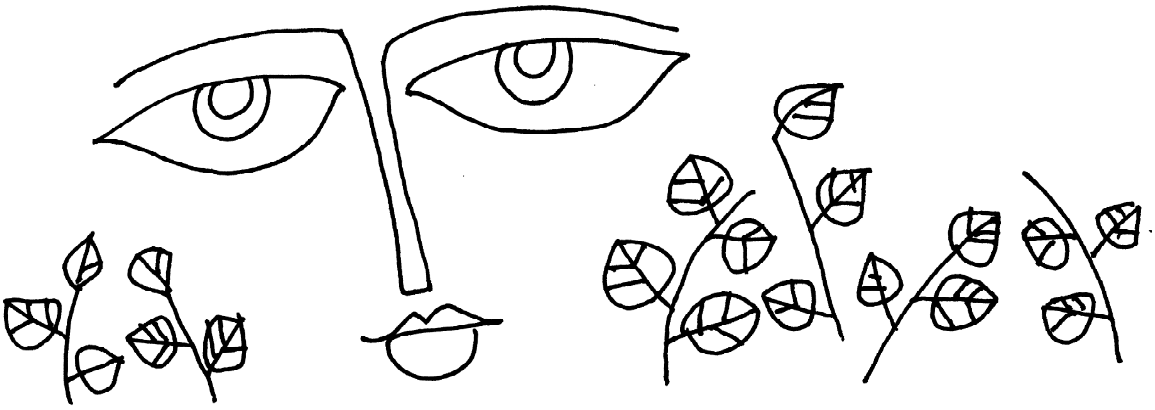

তুলসীরা ঝরে যায়

দীনরঞ্জন দাস

ছাত্র, বাণিজ্য বিভাগ

তুলসী আমাদের বাড়ির কাজের মেয়ে। অনেকদিন ধরে আছে। তার কাজকর্মের মধ্যে যেন ছন্দ আছে। আর কী দ্রুত। ঘর মোছা, আঁচ সাজানো, থালা বাসন মাজা ইত্যাদি করে যেন যন্ত্রের মতো। এমনি করে ও নাকি আট বাড়ি কাজ করে। পাখি-ডাকা ভোরে উঠতে হয় তাকে। গায়ে পাখা বেঁধে ঘুরতে হয় এ বাড়ি ও বাড়ি। ফিরতে হয়ে যায় বেলা বারোটা। তখন রান্না-খাওয়া, ঘর-গৃহস্থালির কাজ আর একটু বিশ্রাম। আবার বিকেল ৩টা থেকে ঘোরে তার গাড়ির চাকা। ফিরতে রাত হয় আটটা নটা। ঠিক সময়ে সব বাড়িতে হাজিরা দেবে, কোনোদিন দেখিনি কামাই করতে। বিনিময়ে পায় মাত্র দেড়শো টাকা। খেতে আর ভাঙা বেড়ার ঘরের ভাড়া দিতেই সব ফুরিয়ে যায়। হাতে থাকে না কিছু। এত পরিশ্রমের বিনিময়ে এই মূল্য — আমার বড়ো দুঃখ হত। একদিন জিজ্ঞেস করলাম —

তুলসী, তোমার তো কিছুই জমে না, তাহলে অসুখ-বিসুখ হলে দেখবে কে?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল — তখন যা হয় হবে। দাদাবাবু আমার কপালটাই দুঃখের। নিজে সারাজীবন তো এইভাবে কাটাচ্ছি, তার উপর একটিমাত্র মেয়েকে বিয়ে দিয়েও সুখী হতে দেখলাম না। ভাগ্যের দোষ ছাড়া আর কী? তবু তো আপনারা সবাই আমাকে ভালোবাসেন, এই আমার সম্বল।

মনে মনে হাসলাম। তুলসী বড়ো বোকা। অসুখ হলে কোনো বাড়িই ওকে দেখবে না। যতদিন কাজ করবে ততদিন সম্পর্ক। বরং কম পয়সা দিয়ে বেশি কাজ কীভাবে পাওয়া যায় সেই কথা ভাবছে সবাই।

একবার বেশ কয়েকদিন ধরে মেয়েটি আসছে না। তখন খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। সংসারে ওর কাজগুলোই খুব কষ্টের মনে হল। সংসারের কাজে তুলসীর গুরুত্ব তখনই অপরিসীম হয়ে উঠল। একদিন খুঁজে খুঁজে এক

বস্তির মধ্যে ওর বাড়িতে গেলাম। জ্বরে মেয়েটির গা পুড়ে যাচ্ছে। আমাকে দেখে ওর সেই আনন্দ যেন অসুখকে মুহূর্তের মধ্যে সারিয়ে তুলল। বলল — আপনি? হঠাৎ কিছুক্ষণ চুপ করে গেল। জিজ্ঞেস করলাম — কী, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে? মাথা নেড়ে বলল — না। শুধু অতীতের কথা মনে পড়ছে, বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

গ্রামের মেয়ে তুলসী মাকে বছর পাঁচেক বয়সে হারিয়েছে। গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার তুলসীর বাবা, মায়ের যত্নে মেয়েকে মানুষ করেছিল। মেয়ের অযত্নের ভয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ের কথা ভাবেনি। কিন্তু তুলসী যখন ডাগর হয়ে উঠল হঠাৎ বাবার চোখ বুজল। অকূলে ভাসল মেয়েটি। তুলসীর লেখাপড়াও বেশিদূর এগোয়নি। তবে ঘরের কাজকর্মে হয়ে উঠেছিল পটু। দূর সম্পর্কের জ্ঞাতিরা বিয়ে দিল গ্রামের একটি ছেলের সঙ্গে সে নাকি শহরের কোনো কারখানায় কাজ করত। ছেলেটি উপযাচক হয়ে বিয়ে করেছিল। শহরে এসে বস্তিবাড়িতে লক্ষ্মীর সংসার পেতে সুখীও হয়েছিল তুলসী। অভাব থাকলেও অভিযোগ ছিল না। কিন্তু কী যে হল ওর স্বামীর হঠাৎ নিরুদ্দেশ হল আর একটি মেয়েকে নিয়ে। বছর দুয়েকের বাচ্চা মেয়ে নিয়ে তুলসী ভাসল অকূলপাথারে। কান্নাকাটিতে কয়েকদিন গেল। একবার ভেবেছে মেয়ে নিয়ে দেশে গ্রামে চলে যাই, কিছু না থাক বাবার বাস্তুভিটেটা তো আছে। আবার ভেবেছে সেখানে গিয়ে খাবে কি? পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তার চেয়ে কোলকাতার এই ঘরেই দিন কাটাবে। ঘর ভাড়া, মা মেয়ের পেটের দায় সারতে ঝিগিরি করে। এ পাড়ায় কত মেয়েই তো করে। ঠিকে ঝি-এর চাহিদাও খুব।

তারপর কত বছর কেটে গেছে। জীবনের অনেকগুলো বসন্ত চলে গেছে পাতাঝরা হেমন্তের বিকেলে। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও মেটাতে পারেনি সে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। মাত্র দেড়শো টাকা তাকে দিয়েছে বেড়ার ঘরের শীতের হিমেল হাওয়া, বর্ষার টালিভাঙা অঝোর বৃষ্টির নিদ্রাহীন রাত্রির গৃহকোণ। আর একবেলা আহার ও অর্ধাহার। তবু তুলসী মরে যায়নি, মৃতের জীবন বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। সে জানে না তার মূল্য। তার একমাত্র পরিচয় ‘‘কাজের মেয়ে”।

শুধু তুলসী নয়, এইভাবে তুলসী মঞ্চের কত তুলসী পাতা প্রতিদিন ঝরে পড়ছে।

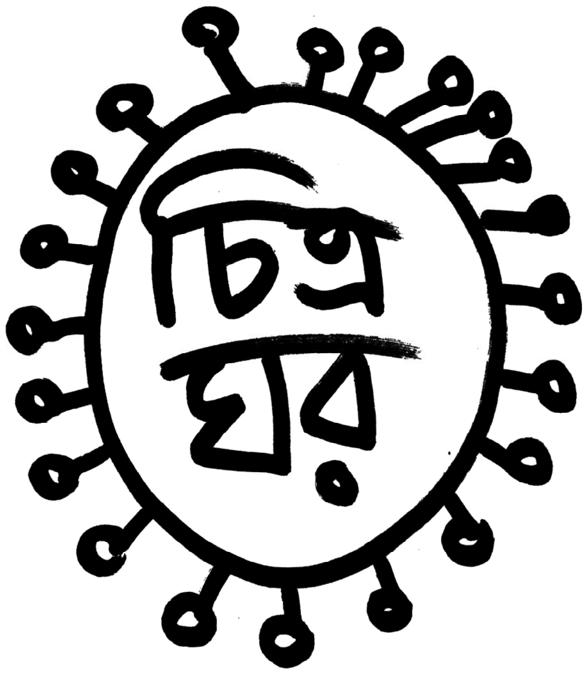

নানাস্বাদের নানান রেখায়
সেজে উঠেছে ছবির ঘর।
ছবির ঘরের ছবির সঙ্গে
দুকলম ছড়ার ছোঁয়া পাঠকের জন্য।